# ছু
# ট্

বাণীশিল্প কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৬০

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১১৩ই কেশবচন্দ্র সেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রাকর
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬ বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

# জগত্তারিণী অনাথ-আশ্রম

ছোট্ট একটি পুকুর।

তারই স্থির জলে টুপ কোরে পড়লো একটি ঢিল। ঢিলটা তলিয়ে গেল পুকুরের তলায়, আর জলের ওপর তৈরি কোরে গেল গোল গোল ঢেউ। সেই গোল-ঢেউ বড় হতে হতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো পুকুরের পাড়ের দিকে ; যেমন কোরে ব্লটিং পেপারের ওপর কালির ফোঁটা ফেললে সেটা চারিধারে বাড়তে থাকে, ঠিক তেমনি কোরে।

ঐ ভেসে-চলা ঢেউয়ে চোখ লাগিয়ে কারুর দৃষ্টি যদি পুকুরের পূব-পাড়ে গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে দেখা যাবে পাড়ের ওপর ন'-দশ বছরের দুটি ছোট্ট ছেলেকে। পাশাপাশি চুপচাপ জলে পা-ডুবিয়ে বসে থাকতে থাকতে একটি ছেলে আর-একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে জলে।

ভুঁই-পটকা ছুঁড়ে দিলে সেটা যেমন মাটিতে পড়েই দুম্ কোরে আওয়াজ করে,—ঢিলটা যেন ঠিক তেমনি জলেতে পড়েই আওয়াজ কোরে উঠলো,—"পল্টু, ভ্যাব্লা !"

সত্যিই তা বোলে ঢিলটা এমন আওয়াজ করেনি ! করেছেন যিনি, তাঁর নাম রাখহরি দত্ত। ছেলেরা বলে, থরহরি কম্প ! তা চেহারাটা সেই রকমই বটে !—যেমন মোটা, তেমনি কুচকুচে কালো।

জগত্তারিণী অনাথ-আশ্রমের এই কুচকুচে কালো এবং বেঢপ মোটা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পুকুরের পশ্চিম-পাড় থেকে পূব-পাড়ের দিকে বেত উঁচিয়ে তেড়ে আসতে আসতে চেঁচাতে থাকেন,—"তোদের বড় আসপদ্দা বেড়েছে ! —ঘুচোচ্ছি আমি তোদের বদমাইসি। আধঘণ্টা হয়ে গেল এঁটো বাসন নিয়ে এসেছিস ঘাটে ; বাসন রইল পড়ে,—জলে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা হচ্ছে ?"

সত্যিই ভারী অন্যায় হয়ে গেছে পল্টু আর ভ্যাব্‌লার। ওদের ওপর অনাথ-আশ্রমের বাসন মাজবার ভার। রোজই ঠিক মাজে। আজও মাজতো। কিন্তু কাল পিঠ চুলকে দেবার সময় পল্টুর হাতের নখ লেগে পিঠটা একটু ছড়ে যাওয়ায় গোটা একটা বেত ভেঙ্গেছেন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পল্টুর পিঠে। সারারাত কাল ঘুমোতে পারেনি পল্টু পিঠের যন্ত্রণায়। সেই কথাটাই আজ দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে বাসন মাজবার কথাটা যে কখন ভুলে গেছে, খেয়ালই নেই।

সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে এমন বিদঘুটে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসতে দেখে একলাফে ঘাটের কিনারায় নেমে বাসন মাজতে লেগে যায় দুজনে। কিন্তু বাসন মাজবে কি!—সমস্ত শরীর ওদের তখন থরথর কোরে কাঁপছে 'থরহরি কম্পে'র ভয়ে!

পুকুরপাড়ের ব্যাঙগুলো সব ছলাৎ ছলাৎ কোরে লাফিয়ে পড়তে লাগলো জলে;—সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আসছেন কিনা পাড় দিয়ে হেঁটে!—একটা কুকুর পুকুরপাড়ের লতাপাতার মধ্যে থেকে কি একটা ওষুধ খুঁজে খাচ্ছিল, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মারলেন তাকে এক লাথি। সেটা কেঁউ কেঁউ কোরে পালালো! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এসে দাঁড়ালেন ঘাটের ওপরের সিঁড়িতে। হাতের বেতটাও যেন তাঁর সঙ্গে তখন সমানে হাঁপাচ্ছে।

হাঁক দিলেন,—"উঠে আয়।"

ভয়ে কাঠ হয়ে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে।

আবার চিৎকার,—"এলি?"

এলো। উঠে এলো ভ্যাব্‌লা। দাঁড়ালো এসে রাখহরিবাবুর সামনে। সেই সময় রাখহরিবাবুর মুখেচোখে যে কুৎসিত নিষ্ঠুরতার ছাপ ফুটে উঠলো, আমরা তা নাই বা দেখলুম। বন্ধই না হয় করলুম আমাদের চোখ দুটো।

চোখ বুঁজে আমরা বেশ কিছুক্ষণ ধোরে শুনতে পাবো কেবল একটানা

সপাং সপাং বেঁতের শব্দ। তারপর হঠাৎ সেটা থেমে যেতেই শুনতে পাবো সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কণ্ঠস্বর,—“খুব বরাত-জোর আজ তোদের। নৈলে আমার হাত থেকে বেত ছিটকে জলে পড়ে?”

অসময়ে হাতের সুখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন রাখহরিবাবু।

এইবার আমরা চোখ খুলে তাকালে দেখবো,—ছুপুর রোদে দাঁড়ালে নিজের শরীরের ছায়া যেমন পায়ের কাছে জড়ো হয়ে পড়ে,—ঠিক তেমনি কোরে সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পায়ের কাছে জড়ো হয়ে কুঁকড়ে আছে ভ্যাব্‌লা।—পিঠে বেতের দাগ দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুটে রয়েছে।

“তাড়াতাড়ি বাসন মেজে ছুজনে আমার ঘরে আসবি। দেরি হলে ছাল-চামড়া রাখবো না পিঠের।”—হুকুমজারি কোরে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে রাখহরি দত্ত ফিরে যান। আহা, পরিশ্রম কি বড় কম হয়েছে?

এবার আস্তে আস্তে উঠে এসে পল্টু সস্নেহে হাত রাখে ভ্যাব্‌লার পিঠে। ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে ভ্যাব্‌লা। পল্টু ভিজে গলায় স্নেহের সঙ্গে বলে,—“খুব লেগেছে বুঝি রে ভ্যাব্‌লা?—তুই, তুই না, তুই ঐ ওপাশের ডুমুর গাছের ছায়ায় গিয়ে বোস গে। রোদ্দুরে আর থাকিসনে রে। বাসনগুলো আমি একাই মেজে দিচ্ছি।”

একঘণ্টা পর।

ছোট্ট ছোট্ট ছু-জোড়া হাতে সুপারিনটেণ্ডেণ্টের ছুটি গোদা গোদা রোমশ পা টিপছে পল্টু আর ভ্যাব্‌লা। সুপারিটেণ্ডেণ্টের চোখ ছুটি ঢুলে আসছে আরামে। হাতে তাঁর একটি বই,—‘পৃথিবী-ভ্রমণ’।

পৃথিবী?

পা টিপতে টিপতে পল্টু তাকায় ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে।—অনাথ-আশ্রমের কম্পাউণ্ডের বাইরে ধু ধু চাষের ক্ষেত,—চাষী

বোসে ভাত খাচ্ছে,—তার ছোট মেয়েটি ডুরে একটি শাড়ী গাছকোমর দিয়ে পোরে দাঁড়িয়ে আছে জলের ঘটিটি নিয়ে। বাপের খাওয়া হলে ঐ ক্ষেতের আল ধোরে ধোরে হেঁটে বাড়ী যাবে মেয়েটি।

ঐ যে ক্ষেতের শেষ,—যেখানে গোটাকতক খেজুর গাছ ছোট্ট ছোট্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে,—তার পরেও তো কতো কী আছে! তারপরে আরো, আরো, আরো। ওঃ পৃথিবীটা কতো বড়ো!

পৃথিবীর কথা ভাবতে গিয়ে পল্টুর হাত-দুটো হয়তো ঠিক জোরে চলছিল না; নৈলে রাখহরিবাবু হঠাৎ চেঁচিয়েই বা উঠবেন কেন,—খেতে পাস না?"

খেতে?—হ্যাঁ পায় বৈকি! খানিকটা ভাত, আর খানিকটা হলদে রঙের জল রোজ পায় খেতে। মাঝে মাঝে আলু-মুলোও যে ছিটেফোঁটা না পায় এমনও নয়। তাতে যদি ছেলেদের পেট না ভরে তো সে তাদের পাকস্থলীর দোষ। আর সে খাবার যদি ছেলেদের মুখে না রোচে তো সে তাদের জিভের বদমাইসি!

পা দিয়ে একটা ঠেলা দেন রাখহরিবাবু,—"খেতে পাস না?—টেপ জোরে জোরে।"

"টিপছি স্যার।"

আরো আধঘণ্টা কেটে গেছে।—নাকডাকার শব্দে পা-টেপা থামায় ওরা। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তখন কোন্ স্বপ্নের ভেতর দিয়ে পৃথিবীর কোথায় ভ্রমণ করছেন কে জানে! 'পৃথিবী-ভ্রমণ' বইখানা কিন্তু হাত থেকে খসে পড়েছে বিছানায়।

আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে বইটিকে তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে পল্টু আর ভ্যাব্‌লা বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে। তারপর সেখান থেকে সোজা সেই পুকুরধারের ডুমুর গাছের তলায়।



তারপর আরো একঘণ্টা পরে তেমনি সন্তর্পণে বইটিকে আবার বিছানার ওপর যেমনটি ছিল তেমনটি কোরে রেখে পল্টু আর ভ্যাব্লা যখন কাঁচুমাচু মুখ কোরে বোসে থাকে,—তখন তাদের দেখে কে বলবে যে তারা ঘণ্টাখানেক ধোরে ঘরের বাইরে ঐ পুকুরধারের ডুমুর গাছের ছায়ায় বোসে 'পৃথিবী-ভ্রমণ' বইটার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে গিলে খেয়েছে !

গভীর রাত। ঘুমিয়ে পড়েছেন সুপারিনটেণ্ডেন্ট রাখহরিবাবু তাঁর নরম গদির ধবধবে বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়েছে অনাথ-আশ্রমের ক্লান্ত অসহায় ছেলের দল লম্বা দালানে পাতা সারি সারি ছোট ছোট সতরঞ্চিতে। ঘুম নেই শুধু পল্টু আর ভ্যাব্লার চোখে। একই বালিসে মাথা দিয়ে দুজনে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কালো অন্ধকারের দিকে। সুপারিনটেণ্ডেন্টের হাতের সেই 'পৃথিবী-ভ্রমণ' বইখানা ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওদের চোখ থেকে। অনেক বড় পৃথিবীটা তার অনেকখানি জায়গা নিয়ে কেবলই যেন ডাকছে ওদের আজ দুপুর থেকে।

পল্টু একসময় ফিসফিসিয়ে বোলে ওঠে,—"যাবি ভ্যাব্লা ?"

"কোথায়" ?—ভ্যাব্লা তার বড় বড় চোখ তুলে তাকায় পল্টুর দিকে।

"পৃথিবী দেখতে।"

"সে যে অনে-ক দূর।"

"হোক না।"

"রাস্তা চিনবি কি কোরে ?"

"ঠিক চিনে নেব লোকেদের জিগ্যেস কোরে কোরে।"

"কি কোরে পালাবি ?"

"সে আমি ঠিক ব্যবস্থা করবোখন।"

"খাবো কোথায়? আমাদের তো কেউ নেই।"

"দোকানে দোকানে খাবো;—পয়সা দিয়ে কিনে কিনে।"

"পয়সা পাবি কোথায়?"

"সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পকেটে।"

"চুরি করবি?"

"ও কেন আমাদের মারে?"

"কোথায় যাবি?"

"সে অনেক-অনেক জায়গা।—বোম্বাই, রানাঘাট, কোপেনহ্যাগেন, পিসার টাওয়ার, তাজমহল, নায়েগ্রা, পিরামিড·········।"

## নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন

দিন তিনেক পর।—সকাল বেলা। মফঃস্বলের ছোট টাউনের রাস্তা। সেই রাস্তার ধারে ছোটখাটো একটি স্টেশনারী দোকান। কলকাতা থেকে খবরের কাগজ এসে গেছে। সেগুলিকে গুনতি কোরে কোরে কাউণ্টারের ওপর গুছিয়ে রাখছিলেন দোকানদার ভদ্রলোক। হুড়মুড় কোরে দোকানের মধ্যে ঢুকে পোড়ে পল্টু বলে,—"আজকের একটা কাগজ দিন তো মশাই।"

"বাংলা কাগজ দেবেন কিন্তু। ওসব ইংরিজি-মিংরিজি অত জানি না।" —ভ্যাব্‌লা যোগ কোরে দেয়।

নিজের কাজ করতে করতেই একটা কাগজ এগিয়ে দেন দোকানদার। সেটাকে উল্টেপাল্টে দেখে ফিরিয়ে দিয়ে পল্টু বলে,—"উঁহু,—আর কোনো কাগজ আছে? আনন্দবাজার?"

"তা না থাকে তো বসুমতী বা যুগান্তরও দিতে পারেন।"—ভ্যাব্‌লা বক্তব্যটা আরো পরিষ্কার কোরে দেয়।

ওদের রকম-সকম এবং কথাবার্তায় কেমন সন্দেহ হয় দোকানদারের। জিজ্ঞেস করেন,—"পয়সা আছে সঙ্গে?"

"সিওর।"—হ্যাফপ্যান্টের পকেটটায় বাইরে থেকে নাড়া দিয়ে পল্টু বললে,—"শুনতে পাচ্ছেন আওয়াজ? পয়সা না নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবো, এমন কাঁচা ছেলে পেলেন নাকি আমাদের?—কি বল রে ভ্যাবলা? তোর বুক পকেটটা নেড়েও একবার শুনিয়ে দে তো আওয়াজটা।"

ভ্যাব্‌লা সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুক পকেটে চাঁটা মারে।

"কি মশাই? এবার বুঝেছেন তো পয়সা আছে কিনা। কিন্তু পয়সা দিয়ে তা বোলে কাগজ কিনছি না আমরা। আরো অনেকদিন অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে তো। বেশি কিছু সঙ্গে কোরে বেরোই নি কিনা।"

"তাছাড়া সুপারিনটেণ্ডেন্টের পকেটে আর যে ছিলও না কিছুই; তা না হলে···" পল্টুর চিমটি খেয়ে মাঝ পথেই থেমে যায় ভ্যাব্‌লা।

কাগজ গুছোতে গুছোতে দোকানদার অন্যমনস্কভাবে বলেন,—"বিনা পয়সায় কাগজ পড়া যায় না খোকা।"

"বাঃ রে,—সবটা কে চাইছে পড়তে?—শুধু তো একটা দুটো বিজ্ঞাপন মাত্তর। বেশ তো, পড়তে না দেন, আপনিই না হয় সেই জায়গাটুকু খুঁজে পেতে পড়ে শোনান আমাদের। তাতে তো আর আপত্তি নেই? পড়ুন না, পড়ুন। ঐ যেখানে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনগুলো থাকে, দেখুন তো পড়ে,—দুটি ছোট ছোট ছেলে,—এই ধরুন আমাদেরই মতন;—অনাথ-আশ্রম থেকে পালিয়ে ······।"

পল্টুর কথা শেষ হবার আগেই ভ্যাবলা একটিবার মাত্র দোকানদারের মুখের দিকে তাকিয়েই পল্টুর হাতটা ধোরে প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা মেরে বোলে ওঠে,—"পালা পল্টু।"

## বেশ ছেলেটি !

দে ছুট্‌ দে ছুট্‌ দে ছুট্‌ ।—ছুটতে ছুটতে অনেকগুলো হিজিবিজি গলির মোড় বেঁকে একটা বড় বাড়ীর সিমেণ্টের রোয়াকে বোসে হাঁফাতে হাঁফাতে ভ্যাব্‌লা বললে,—"ওরেব্‌ বাবা ! আর একটু হলেই লোকটার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলুম আর কি !"

"হুঁ, বড় বেফাঁস বোলে ফেলেছিলুম রে। মাঝখান থেকে খবরের কাগজটাই পড়া হোল না ছাই।"—পণ্টু আফসোস করে,—"সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আমাদের পালানোর বিজ্ঞাপন দিয়েছে কিনা দেখাই হোল না।"

ভ্যাব্‌লা বললে,—"ক'টা পয়সা খরচ কোরে কাগজ একটা কিনে নিলেই পারতিস !—বড় কিপ্‌টে তুই।"

ভূপর্যটকের গাম্ভীর্যে পণ্টু জবাব দেয়,—"পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরিয়ে কি অতো বাজে খরচ করলে চলে ?"

ক্রিং ক্রিং ক্রিং।—সাইকেলের পেছনে কাগজ চাপিয়ে একটি হকার এসে নামে ওদেরই কাছে। রকের গায়ে সাইকেলটাকে ঠেস দিয়ে ফস কোরে একটা কাগজ টেনে নিয়ে ওদের হাতে দিয়ে বলে,—"বাবুকে বোলে দিও বেলায় এসে টাকা নিয়ে যাবো আজ।"—কথাটা শেষ কোরেই সাইকেল নিয়ে সাঁই-সাঁই কোরে অনেক দূর চলে যায় চক্ষের নিমেষে।

ভ্যাব্‌লা হ্যাংলার মতন সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে,—"অমনি একটা সাইকেল থাকলে ভূ-প্রদক্ষিণ করতে যা মজা ! না রে পণ্টু ?"

পণ্টু ইতিমধ্যে সেই খবরের কাগজে মন দিয়েছে। অনেক খুঁজে-পেতেও নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের কোথাও নিজেদের নাম দেখতে না পেয়ে

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে,—"যাক বাবা, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বিজ্ঞাপন দেয়নি তাহলে কোনো।"

ভ্যাব্‌লা ঠোঁট উল্টে বললে,—"বিজ্ঞাপন দেবে না ছাই। বেঁচে গেল ও। খরচ কমে গেল তুটো ছেলের।"

"আমাদের সেই চিঠিটা সুপারিনটেণ্ডেণ্টের চশমার খাপে ঠিক রেখেছিলি তো তুই ?"—পল্টু একটু যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

"সিওর।—একেবারে চশমা পরতে গেলেই পাবে।"—ভ্যাব্‌লা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে।

চশমা পরতে গিয়েই সত্যি পেলেন রাখহরিবাবু ওদের চিঠিটা। পড়লেন,—

"ভোঁদকা মোটা সুপারিন ঠন্‌ঠন্‌ মশাই,
চলিলাম।—কোথায় ? জানি না। পৃথিবীর শেষ দেখিব।"

রাখহরিবাবু নিজের মনেই বললেন,—"দেখাচ্ছি।"

—আবার পড়লেন।

"বোম্বাই,—রানাঘাট, কোপেনহ্যাগেন, হিমালয়, ভিসুভিয়স, নায়েগ্রা জলপ্রপাত, পিরামিড, পিসার টাওয়ার, চীনের প্রাচীর, সব সব স-ব কিছু দেখিয়া মানুষ হইব।"

রাখহরিবাবু বোলে উঠলেন,—"শুয়োর !"

আবার পড়লেন।

"তখন তো আমরা বড় হইয়া যাইব। খুব জোর হইবে গায়ে। তখন যদি আপনাকে সামনে পাই, বেত মারিয়া পিঠের ছাল তুলিব আপনার। তখন বুঝিবেন শুধু শুধু ছোট ছেলেদের মারিলে কত কষ্ট হয়।"

রাখহরি ক্ষিপ্ত হয়ে হাতের বেত নিজের পায়েই মেরে চিৎকার কোরে

উঠলেন,—"হতভাগা।"—সঙ্গে সঙ্গে বেতের যন্ত্রণায় নিজেই লাফিয়ে উঠে বললেন,—"উফ্!"

কিন্তু ওদের চিঠি তখনও শেষ হয়নি। সব শেষে ওরা লিখেছে,—"সতু, ন্যাবা, হরি, মান্‌কে, চণ্ডী, শম্ভুকে আমাদের ভালবাসা দিবেন। আর ফট্‌কের সঙ্গে ভ্যাব্‌লার ঝগড়া হইয়াছিল,—তাহাকে বলিবেন ভ্যাবলা ভাব করিয়াছে। ইতি—

পল্টু ও ভ্যাব্‌লা।"

পল্টু ও ভ্যাব্‌লা তখনও সেই রকে বসে। পল্টু বললে,—"চ এবার উঠি।"

ভ্যাব্‌লা বললে,—"কিন্তু কাগজটা?—কাগজটা দিতে বোলে গেল যে সাইকেলওলা।"

ঠিক এই সময় বাড়ীর সদর-দরজাটা ঘটাং কোরে খুলে যায়। বেরিয়ে আসে ওদেরই বয়সী একটি ছেলে। ওদের দেখে বিস্মিত হয়ে বলে,—"কে তোমরা?"

"আমরা?"—কী যে খেয়াল হয় পল্টুর, গম্ভীর চালে বেমালুম বোলে বসে,—"আমরা আসছি খবরের কাগজের অফিস থেকে।"

"যাও, কাগজটা বাড়ীর ভেতর দিয়ে এসো।"—এবার ভ্যাব্‌লা বলে।

"কিন্তু কাগজ তো রোজ অন্য লোকে দেয়। তোমরা?"—ছেলেটির কেমন যেন বিশ্বাস হয় না।

"আমরাই তো কাগজ ছাপি।—আমার পাশে এই যে ইনি বসে রয়েছেন না,—এঁর নাম ভ্যাব্‌লাবাবু। উনিই লেখেন, আর আমি ছাপি।"—বোলে পল্টু থামে। ভ্যাব্‌লা যোগ দেয়,—"কাগজে যে ওর বেশি জায়গা নেই,—তা না হোলে আরো বেশি লিখতে পারতুম।"

অত বড় কাগজে ঐটুকু ছেলে লেখে ? কী সাংঘাতিক ! চট্ কোরে বিশ্বাস কোরে নিতে ভাল লাগে না ছেলেটির। বলে,—"বলো দিকিনি গবাক্ষ মানে কি ?"

হো-হো কোরে হেসে উঠলো পল্টু আর ভ্যাব্লা। হাসতে হাসতে ভ্যাব্লাকে ঠেলা দিয়ে পল্টু বললে,—"ভ্যাবলা, ওরে ভ্যাব্লা, কি বলে ছাখ। বলে কিনা গবাক্ষ মানে জানি না।—ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য, মুখ্য, গবাক্ষ।—দ্বিতীয়ভাগে পড়িনি নাকি ?"

ছেলেটির আবার কেমন সন্দেহ হয়। বলে,—"ঐক্য বাক্য মাণিক্য মুখ্যের পরে তো গবাক্ষ নয়,—তারপর তো অখ্যাতি উপাখ্যান ভাগ্য যোগ্য আরোগ্য।"

পল্টু গম্ভীরভাবে পা নাচিয়ে বলে,—"ওরই মধ্যে গবাক্ষও আছে।"

হবেও বা। দরকার নেই তর্ক কোরে। কিন্তু মানেটা ?

ছেলেটি বলে,—"গবাক্ষ মানে কি ?"

পল্টু হাসে,—"ওরে ভ্যাব্লা, বোলে দে বোলে দে।"

পল্টু বিপদটাকে ভ্যাব্লার ঘাড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করে।

ভ্যাব্লা পল্টুর চেয়ে বিজ্ঞের হাসি হেসে বলে,—"তুই-ই দেনা বোলে। ওর আর বলার আছেটা কি ?"

ছেলেটি এবার চেপে ধরে,—"বাজে কথা ছেড়ে বলো না আগে। দেখি তোমাদের কত বিছে।"

এবার আর না বোলে উপায় থাকে না। কিন্তু কি বলবে ? গবাক্ষ কথাটার কী যে মানে কে জানে ?—পল্টু আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ে,—"ওরে ভ্যাব্লা শোন্ কথা। বলে আমাদের বিছে দেখবে,—আমরা নাকি গবাক্ষ মানে জানি না।—ছোটবেলায় আমরা কত গবাক্ষ খেয়েছি ভ্যাব্লা, য়্যাঁ ?"

"ওঃ! এক একদিন তো শুধু গবাক্ষ খেয়েই পেট ভরিয়েছি।"—ভ্যাব্লাও যোগ কোরে দেয় চোখ-কান বুজে।

"কচু করেছ।"—হো-হো কোরে হাসতে হাসতে ছেলেটি এবার বলে,—"বোকারাম, গবাক্ষ মানে জানলা।"

ভ্যাব্‌লাটা লজ্জায় গুটিয়ে যায়। এঃ! অচেনা ছেলেটার কাছে যাচ্ছেতাই হার হোল একেবারে। বিদ্যেবুদ্ধি সব ধরা পড়ে গেল! পল্টুর কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই। বললে,—"গবাক্ষ মানে কি বললে?"

ছেলেটি তখনো হাসছে।—বললে,—"জানলা গো, জানলা।"

পল্টু বললে,—"আমিও তো তাই বলেছিলুম।"

এবার চটে ওঠে ছেলেটি। বলে,—"তোমরা তো বললে খেতুম।"

"খেতুমই তো।"—পল্টু অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দেয়,—"রান্নাঘরের গবাক্ষের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে কতো খাবার খেয়েছি লুকিয়ে লুকিয়ে।"—

ওঃ, কী ওস্তাদ পল্টুটা। কথাটাকে কেমন কায়দা কোরে ঘুরিয়ে নিলে। ভ্যাব্‌লার ইচ্ছে করে পল্টুর পায়ের ধুলো নিতে।

হাসি থেমে যায় ছেলেটির। পল্টু এবার মাতব্বরের মতো বলে,—"আমাদের কাগজের ছাপাখানাটা একদিন দেখতে যেও ভাই।"

"তোমাদের নিজেদের ছাপাখানা নাকি?"

"তবে না তো কি।"

অচেনা দুটো ছেলের এতখানি ওস্তাদী যেন সহ্য হয় না আর। কি ভেবে ছেলেটি হঠাৎ বোলে ওঠে, "ভারী তো ছাপাখানা! তোমাদের তো আর টেলিস্‌কোপ্‌ নেই।"

"কি কোপ?—কি কোপ বললে?" পল্টু জিজ্ঞেস করে

"হি-হি-হি-। টেলিসকোপ টেলিসকোপ।—নামও শোনোনি বুঝি কখনো?"—ছেলেটি এতক্ষণে মাতব্বরী করবার সুযোগ পায়।

ভ্যাবলা আর একটু হোলেই বোলে ফেলেছিল আর কি,—"না, নামটাই পড়েছি শুধু বইয়ে। তবে চোখে দেখিনি কখনো।"—ভাগ্যিস পল্টু ওকে

ঠিক সময়ে থামিয়ে দিলে। থামিয়ে দিয়ে পল্টু মুরুব্বি চালে বললে,—"কই দেখি ?"

যন্ত্রের নামটা উহ্য রাখলো পল্টু। কি জানি, বাবা, আবার যদি উচ্চারণের ভুল হয়ে যায়, তখন তো আবার ছেলেটা দাঁত বের কোরে হাসবে হি-হি কোরে।

"কই দেখি ?" পল্টু আবার বলে।

"বারে, এখানে কি কোরে দেখাবো। বাড়ীর ভেতর এসো আমার সঙ্গে।"

"বাড়ীর ভেতর ?—ইতস্তত করে পল্টু।

"হ্যাঁ। ছাতের ঘরে। সেইখানেই তো আছে কিনা টেলিসকোপটা।"—ছেলেটি দেখাবেই।

"কিরে ভ্যাব্‌লা ?"—পল্টু পরামর্শ চায়।

ভ্যাব্‌লা সাফ্ জবাব দেয়,—"চ'ই না।"

## টেলিসকোপ

ছোটকাকা ভয়ানক বদরাগী। তাঁরই টেলিসকোপ। ছেলেটি লুকিয়ে লুকিয়ে চুপিসাড়ে ওদের ছাতের ঘরে নিয়ে গিয়ে টেলিসকোপের কারসাজী দেখায়। ভয় করে খুবই। কিন্তু এ না করলে অচেনা ডুটো ছেলের কাছে মান থাকতো না যে!

দেখতে দেখতে অবাক্ হয়ে যায় পল্টু আর ভ্যাব্‌লা! কী আশ্চর্য যন্ত্র!—ঐ অত্ত দূরের তালগাছটার পাতাগুলো সব গোনা যাচ্ছে। ওমা!—গাছটার ওপর আবার একটা পাখী বোসে আছে যে রে!—ইচ্ছে করে পৃথিবী ভ্রমণ স্থগিত রেখে এই টেলিসকোপ নিয়েই বছরের

পর বছর কাটিয়ে দেয়। ওঃ, এর চেয়ে মজা আর কিছু আছে নাকি?

"কি গো এমন জিনিস দেখেছিলে কখনো এর আগে?" ছেলেটি এবার চাল মারে।

কিন্তু দমবার পাত্র নয় পল্টু। মুরুব্বি চালে বলে,—"হুঁ হুঁ,—ওরে ভ্যাব্‌লা,—কি বলে গ্যাখ্।—আমার নিজেরই যে ছিল একটা। হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। অবশ্য তোমার এই টেলিকোপটাও…"

"টেলিসকোপ।"—হেসে শুধরে দেয় ছেলেটি।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, টেলিসকোপ।—তোমার টেলিস্‌কোপটাও মন্দ নয়। তবে আমার যেটা ছিল……ভ্যাব্‌লা?"—পল্টু ভ্যাব্‌লাকে সাক্ষী মানে।

ভ্যাবলা তখন টেলিসকোপের ভেতর দিয়ে দেখছে অনেক উঁচু আকাশের একটা চিলকে। অন্যমনস্ক ভাবে শুধু বললে,—"আই বাপ্।"

পল্টু তখন বোলেই চলেছে,—"একদিন রাত্তিরে আমার সেই টেলিসকোপটা নিয়ে আকাশের চাঁদ দেখছি,—ওমা,—দেখি চাঁদের গায়ের বরফের পাহাড়ের ওপর একটা লোক দাঁড়িয়ে।"

"চাঁদে?"—চমকে ওঠে ছেলেটি।

"হ্যাঁ, চাঁদে। যাকে বলে চন্দ্রগ্রহে। দেখি, লোকটা আমাদের দিকে হাতজোড় কোরে বলছে,—'আমাকে গুলি মেরো না ভাই, আমাকে গুলি মেরো না ভাই।'—হুঁ হুঁ,—সেই অত দূরের চাঁদ থেকে লোকটা আমার টেলিসকোপটাকে বন্দুক ভেবেছিল কিনা,—তাই ভয় পেয়ে চেঁচাচ্ছিল।"

এবার আর থাকতে পারে না ছেলেটি। এক ঝটকায় ভ্যাব্‌লার হাত থেকে টেলিসকোপটা কেড়ে নিয়ে জিভ ভেংচিয়ে শুধু বললে,—"আর তোমাকে কি ভেবেছিল? ল্যাজকাটা হনুমান?"

"তার মানে?"

"মিথ্যেবাদী কলার কাঁদি,—কলা খেয়ে খেয়ে ঘণ্ট রাঁধি।"

"মুখ সামলে।"

"তোমরা সামলে।"

"তোমার বাড়ীতে ডেকে আনলে কেন তুমি?"

"তোমরা কেন বললে—কাগজ ছাপি? ওঃ,—ঐটুকু পুঁচ্‌কে ছেলেরা আবার কাগজ ছাপেন। মিথ্যুক কোথাকার।"

"ভাল্ল হবে না বোলে দিচ্ছি।"

ঠিক এই সময় নিচের থেকে একটি কর্কশ কণ্ঠ ভেসে আসে,—"এমন সময় ছাতে আমার ঘরে কে র‍্যা?"

"এই রে! ছোট্‌কা! কি হবে? টেলিসকোপটা আমার নয়, ছোট্‌কার। হাত দিতে মানা করেছেন।"—ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় ছেলেটির।—"তোমরা ঐ পেছনের সিঁড়ি দিয়ে পালাও। নৈলে তোমরাও মার খাবে।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পাঁই পাঁই কোরে ছুট্ লাগায় পল্টু আর ভ্যাব্‌লা। অনেকখানি দৌড়ে বাড়ীটাকে বেশ খানিকটা তফাতে ফেলে তারপর আবার আস্তে আস্তে হাঁটে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পল্টু বলে,—"বাব্‌বা, খুব বেঁচে গেছি।"

ভ্যাব্‌লা বলে,—"আহা ছেলেটা বোধহয় এখন খুব মার খাচ্ছে ছোট্‌কার কাছে।"

"বেশ ছেলেটা।"—পল্টু ছেলেটির অনিবার্য প্রহারের কথা ভেবে দুঃখিত হয়। হেঁটে চলে ওরা।

হঠাৎ ভ্যাব্‌লা বলে,—"এই রে।"

"কি হোল?" চমকে ওঠে পল্টু।

রাস্তা থেকে একটা সুতো-ছেঁড়া তামার কবচ তুলে নিয়ে ভ্যাব্‌লা বললে,—"ভাগ্যিস্ ঠক কোরে আওয়াজ হোল। নৈলে জানতেই পারতুম্ না।"

"তাই তো!"—নিজের হাতের দিকে চেয়ে পল্টু বলে,—"ভাগ্যিস্ তোর নজরে পড়লো। চ ঐ তো একটা দোকান, ওখান থেকে নতুন সুতো কিনে বেঁধে নিই।"

সুতো কিনে পল্টুর হাতে কবচটা বেঁধে দিতে দিতে ভ্যাব্‌লা বলে,—"এসব জিনিস হারাতে নেই, পাপ হয়।"

পল্টুর মনটা কিন্তু তখন অন্য দিকে। চোখ দুটোও। বললে,—"ফাইন জিলিপি ভাজছে কিন্তু ভ্যাব্‌লা। খাবি নাকি গোটাকতক? কিংবা ছোট ছোট কচুরি আর হালুয়া? ব্রে লাগে কিন্তু তাহলে, কি বল্?"

ওরা খাবারের দোকানে ঢোকে।

ও-অঞ্চলের নিতান্তই হালফ্যাসানের খাবারের দোকান ওটা। কলকাতার খাবারের দোকানের মতোই টেবিল-চেয়ার আছে, টেবিলের গায়ে এক হাত অন্তর অন্তর ক্যালেণ্ডারের তারিখ কেটে আঠা দিয়ে লাগানো আছে। দোকানদারটিও রীতিমতো শিক্ষিত ব্যক্তি। দস্তুরমতো ক্লাস ফাইভ্ অবধি পড়েছেন। তার প্রমাণ বাইরের সাইন্‌বোর্ডেই—

**উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ভাণ্ডার**

**শিক্ষিত যুবক দ্বারা পরিচালিত**

পল্টু ও ভ্যাব্‌লা সাইন্‌বোর্ডটার দিকে তাকায় দোকানে ঢুকতে গিয়ে। 'উৎকৃষ্ণ' কথাটা কেমন কেমন চোখে লাগে যেন !

শালপাতার ঠোঙা তৈরি করতে করতে শিক্ষিত দোকানদারটি মৃদু হেসে বলেন,—"কি দেখছো Boys ?—উৎকৃষ্ণ ? ঐ ভুলটি প্রত্যেকেই করে। সবাই লেখে উৎকৃষ্ট। আরে, কৃষ্ট হবে কোত্থেকে ? চলিত কথায় লোকে 'কেষ্ট' বা 'কৃষ্ট' বলে বটে,—কিন্তু কথাটা তো 'কৃষ্ণ',—তাই না ?—কৃষ্ণচন্দ্র ;—কৃষ্টচন্দ্র তো নয়। কৃষ্ণলীলা, রামকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, উৎকৃষ্ণ। বুঝলে ?"

পল্টু ও ভ্যাবলা উত্তর দেবার আগেই শিক্ষিত দোকানদারটির আহ্বান আসে,—"নাউ কাম অ্যাণ্ড সিট ব্রাদার্স। হোয়াট ওয়াণ্ট ? সিঙ্গাড়া অর কচুরি, অর জিলেপি ? অল্‌ আর হটস,—সবই গরম।"

"সিঙ্গাড়া গিভ্‌ টু-অ্যানাজ কিংবা চার আনারই দিন।"—পল্টুও ইংরিজিতেই উত্তর দেয় সটান। কেন, ইংরিজিতে পল্টু কিছু কম নাকি ?

"গিভস্‌ হবে না তো রে পল্টু ?"—ভ্যাবলা ফিসফিস কোরে বলে,—"দোকানে তো ঐ একটাই লোক রয়েছে দেখছি। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার,—ভার্বের শেষে একটা 's' যোগ হবে না তো ?"

"খুব মনে করিয়ে দিয়েছিস্‌। 's' একটা যোগ করতেই হবে বটে। কিন্তু সেটা "গিভ" এ নয়, সিঙ্গাড়ায় ! নৈলে শেষকালে সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে চার আনায় একখানা সিঙ্গাড়াই না গছিয়ে দেয় লোকটা।" —পল্টু তাড়াতাড়ি ইংরিজিটা শুধরে নেয়,—"ও মশাই, ও এল্ডার ব্রাদার, আই মিসটেক, আই রং। সিঙ্গাড়া নট, সিঙ্গাড়াজ ; সিঙ্গাড়াজ গিভ ফোর অ্যানাস।" এতক্ষণে বিশুদ্ধ ইংরেজি বোলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফ্যালে যেন পল্টু।

দোকানদার সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটা সামনে ধরতেই কি জানি কি ভেবে

পল্টু বলে,—"নাঃ থাক,—সিঙ্গাড়ার বদলে ঐ ছোট ছোট কচুরিই দিন চার আনার। কচুরিগুলোই ভাল, কি বলিস ভ্যাবলা ?"

সিঙ্গাড়ার ঠোঙাটা নামিয়ে রেখে চার আনার কচুরিই এবার এগিয়ে দেন দোকানদার। ভ্যাবলা ফিসফিসিয়ে বলে,—"তার চেয়ে ঐ জিলিপি-গুলোই বোধহয় ভাল ছিল রে পল্টু। কেমন বেশ বড় বড়।"

"তাহলে তাই-ই দিন এল্ডার ব্রাদার। কচুরির বদলে চার আনার জিলিপিই দিন আমাদের।"—পল্টু এবার একটু লজ্জিত হয়েই বলে,—"কিছু মনে করবেন না যেন,—বড্ড বিরক্ত করছি আমরা।"

"না, না, বিবক্তের কি আছে ? —খদ্দের্স্ আর আওয়াব লক্ষ্মীস্।" জিলিপির ঠোঙা এগিয়ে দিয়ে একগাল হেসে আপ্যায়িত করেন ওদের দোকানদার।

দোকানের ভেতরে সেই যে একটা কল-লাগানো জলের ড্রাম থাকে, তারই ধারে কাঠের বেঞ্চিতে বোসে জিলিপি খাওয়া শেষ করে ওরা। শালপাতার ঠোঙার কাঠি খুলে পাতাটাকে চাটতে চাটতে ভ্যাব্লা বলে,—"ফাইন খেতে কিন্তু রে পল্টু। রোজ রোজ এই দোকানে এসে সকালের জলখাবারটা খেয়ে গেলে বেশ হয়, কি বল ?"

"ভূপর্যটকদের কি আর সে উপায় আছে রে ভ্যাবলা ?"—পল্টু ট্যাঙ্কের জলে হাত ধুতে ধুতে বড় গোছের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গম্ভীরভাবে বলে,—"আজ এই এখানে বোসে গরম গরম জিলিপি খেলুম,—কাল হয়তো সেই সুদূর চীনদেশের কোনো সরাইখানায় বোসে আরশোলার চাটনি চাটতে হবে।"

"আরশোলা ?"—গাটা ঘিনঘিন কোরে ওঠে ভ্যাবলার।—"চীন-দেশটায় কি আমাদের একেবারে না গেলেই নয় রে পল্টু।"

আবার আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পল্টু বলে,—"ভূপর্যটকদের জীবন

এমনিই রে ভ্যাবলা। তোকে তো আমি গোড়াতেই বলেছিলুম,—এ পথ বড় কষ্টের পথ।"

ভ্যাবলা এবার বুক ফুলিয়ে বলে,—"তুই কি মনে করেছিস কষ্ট করতে পারি না আমি? তুই যদি চীনদেশের সরাইখানায় দু-আনার আরশোলার চাটনি খাস,—আমি চার আনার খাবো, দেখে নিস্।"

"এই তো মরদের মতন কথা"—পল্টু বন্ধুগৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে।—"চ' এবার তাহলে যাওয়া যাক।"

"কি হোল?—জিলিপির পয়সা না দিয়েই যে চলে যাচ্ছ ব্রাদার্স? জিলিপিস্ প্রাইস মিসটেকেন?" ওদের চলে যেতে দেখে শশব্যস্তে বলে ওঠেন দোকানদার।

"জিলিপিস্ প্রাইস? বাঃ,—আমরা তো চার আনার কচুরির বদলে চার আনার জিলিপি নিলুম!"—পল্টু প্রায় তেড়েই ওঠে।—"মনে পড়ছে না? সেই যে?"

"ওয়েল্ ব্রাদার্স, তাই না হয় হোল। দেন গিভ্ কচুরিস্ প্রাইস্।"

"তাই বা দোব কেন? বা রে!—কচুরিও কি এমনি নিয়েছিলুম? সিঙ্গাড়ার বদলেই তো কচুরি চেয়েছিলুম।"—পল্টু সোজা হিসেব দেখায়। "সেই যে, চার আনার সিঙ্গাড়ার বদলে চার আনার কচুরি দিলেন আপনি!"

"আচ্ছা বেশ, গুড টক—ভাল কথা। তাহলে ঐ সিঙ্গাড়ার দরুনই দিয়ে যাও না হয় চার আনা।"—দোকানদারও হিসেবে ভুল করেন না।

"সিঙ্গাড়ার দরুন?"—আকাশ থেকে পড়ে যেন পল্টু।—"সিঙ্গাড়া খেলুমই না আমরা, অথচ তার দাম দিতে হবে? সিঙ্গাড়া আমরা খেলুম কোথায় এল্ডার ব্রাদার?"

ছুট

পল্টু আরো ভালো কোরে বোঝায়,—“কিসের দাম চাইছেন আপনি ?”

“সিঙ্গাড়ার।”

“সিঙ্গাড়া কি আমরা খেয়েছি ?”

“না।”

“তাহলে ?”

“ছোট ছেলে পেয়ে ঠকাবেন না”—ভ্যাবলা ফোড়ন দেয়। এবং তারপর বীরদর্পে ওরা বেরিয়ে যায় দোকান ছেড়ে।

“উৎকৃষ্ঠ” খাবারের দোকানের শিক্ষিত দোকানদারের কিছুতেই মাথায় ঢোকে না হিসেবটা। মাথা চুলকে চুলকে অস্থির হয়ে পড়েন বেচারা। নাঃ, হিসেবটা সত্যিই গোলমেলে!

অনেকক্ষণ বাদেও হিসেবটার কোন কিনারা করতে না পেরে দোকানদার চোখদুটোকে বড় বড় কোরে বিড়বিড় কোরে বলেন,—“নাঃ, দে আর গুড এরিথমেটিকস্!”

ওরা ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

## আজব আয়না

বেলা বেড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমেই। রোদ্দুর ঝাঁঝাঁ করতে থাকে। পান চিবোতে চিবোতে চুন লাগানো পানের বোঁটা হাতে নিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা স্টেশনের দিকে দৌড়তে শুরু কোরে দিয়েছেন তখন।

“লোকগুলো অমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে কেন বল্‌তো ?”—ভ্যাবলা জিজ্ঞেস করে পল্টুকে।

ব্যাপারটা পল্টুও ঠিক বুঝতে পারে না! বলে,—“কি জানি,—সব

দল বেঁধে যাচ্ছে কোথায় রে বাবা ?—চল্ ঐ পানের দোকানটায় গিয়ে জিজ্ঞেস করা যাক।”

পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। দোকানের মাঝখানটিতে একটি আয়না। আয়নার পাশটিতে একটি অদ্ভুত ক্যালেণ্ডার টাঙ্গানো। ভারতমাতা দাঁড়িয়ে আছেন হাতে তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে; আর তাঁর পায়ের তলায় কে এক ইংরেজ সাহেব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে তাঁকে। সাহেবের টুপীতে লেখা,—‘বন্দেমাতরম্’।

কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ঐ আয়নাটা! হো-হো কোরে হেসে ওঠে ভ্যাবলা। হাসতে হাসতে কোমর চেপে ধোরে রাস্তায় উবু হয়ে বোসে পড়ে ও’। পল্টু ভ্যাবলার এই হঠাৎ হাসির কোন আদিঅন্ত খুঁজে পায় না। কি হোল কি ওর ?

“এই, হাসছিস কেন হঠাৎ ? এই ছ্যাখো,—অত হাসি কিসের তোর ? শুধু শুধু অমন হাসে নাকি মানুষে ?”—পল্টু একটু রেগেই বোলে ওঠে।

“তোর মুখটা কী রে ?”—বলতে বলতে হাসির দমকে ভ্যাবলা আবার কোমর চেপে ধরে।

“কেন, কি হয়েছে মুখে ?—লেগে আছে বুঝি জিলিপির রস ?”—সার্টের আস্তিন দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে পল্টু বলে,—“তা’ বললেই তো হোত সেটা। হাসবার কি আছে অতো ? সবেতেই যেন বাড়াবাড়ি তোর।”

হাসির বেগটা ততক্ষণে অনেকটা কমে এসেছে ভ্যাবলার। পল্টুর হাতটা ধোরে টেনে আয়নার ঠিক সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে,—“আয়নায় তোর মুখটা ছ্যাখ না, ছ্যাখ।”

হো-হো-হো!

হা-হা-হা!!

হি-হি-হি!!!

দুজনেই হাসতে শুরু করে। বেদম বিপুল হাসি। আয়নায় মুখ ছ্যাখে আর হাসে। হাসে আর মুখ ছ্যাখে।

"কী অদ্ভুত আয়না ভাই পল্টু।—ভ্যাবলা বলে,—"আমাদের মুখগুলো তেড়েবেঁকে কিরকম কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে দেখেছিস?"

আশ্চর্য!—এমন অদ্ভুত আয়না পানওলা পেল কোথায়? আয়না তো পল্টুদের আশ্রমেই আছে গোটা দশেক। পল্টুদের ঘরেই তো থাকতো একটা ভাঙ্গা আয়না, যেটা দিয়ে কুকুর বেড়ালের চোখে রোদ্দুর ফেলে মজা করতো ওরা। কিন্তু কোনোটাতেই তো এমন হাসি-হাসি মুখ হয় না। এমন নাকটা বড়, চোখটা ছোট, ঠোঁটটা বেঁকা, কানটা লম্বা দেখায় না তো!

"খুব দামী আয়না এটা নিশ্চয়ই। পানওলারা খুব বড়লোক হয় কিনা। ভূপর্যটন সেরে বড় হয়ে এমনি একটা পানের দোকান খুলতে হবে,—বুঝলি ভ্যাবলা?"—পল্টুকে বেশ চিন্তান্বিত দেখায়।

"আর, সেই দোকানে এমনি একটা মজাদার আয়নাও রাখতে হবে।" —ভ্যাব্‌লা জোগান দেয়,—"তাহলেই হাসতে হাসতে সবাই খদ্দের হয়ে যাবে আমাদের দোকানের।"

কিন্তু সেটা তো ভূপর্যটনের পরের কথা। এখন সবচেয়ে আগে জানা দরকার একটু আগেই লোকেরা সব হাঁকুপাঁকু হয়ে যাচ্ছিল কোথায়? কাজেই পল্টু প্রশ্ন করে পানওলাকে,—"এই ভাই, ভাই গো, এই এত্‌না সব লোকজন একটু আগে ছুটকে ছুটকে কোথায় যাচ্ছিল গো?"

"টিশন্"

"ইস্টিশান্?—কেন?—কোলকাতায় যাবে বুঝি?—চল পল্টু, আমরাও তাহলে কোলকাতায় চলে যাই এইবেলা। সেখানে কালীঘাটের মন্দির, মনুমেণ্টো সব দেখে তারপর ঝুলন্ত বাগান দেখতে যাওয়া যাবে ব্যাবিলনের।"—ভ্যাবলা তাড়া দেয়।

"এই, বাস্"



"তাই চ'।"

ওরা স্টেশনের দিকে পা চালায়। চলতে চলতে ভ্যাবলা একসময় হঠাৎ বোলে ওঠে,—"আয়নাটা কিনে প্রথম কার মুখের সামনে ধরবি বলতো পল্টু ?"

"সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের।"

## সারমেয়

স্টেশনে এসে যখন ওরা পোঁছয়, তখন স্টেশন ভোঁভাঁ। স্টেশনমাষ্টার হরিপদবাবু টিকিট ঘরের দোরে তালা দিয়ে ফতুয়াটি কাঁধে ফেলে কোয়ার্টারে ফেরবার উদ্যোগ করছেন তখন। ওরা এসে শুধোয়,— 'কলকাতায় যাবো ;—গাড়ী নেই বুঝি ?"

"না।"

"আর আসবে না গাড়ী ?"

"হ্যাঁ। সেই বেলা আড়াইটেয়।"—জবাব দিয়ে হরিপদবাবু তালাটি ঝুলিয়ে প্রস্থান করেন।

"ওরেব্ বাবা!—দুপুর আড়াইটে!—সে যে এখনও অনে-এ-ক দেরী রে পল্টু।"—ভ্যাব্লা মুষড়ে পড়ে!

"কতক্ষণই বা ? তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? ততক্ষণ আয় ঐ কলে চান-টানগুলো সেরে নিই এইবেলা।"

স্টেশনের কলের কাছে গিয়ে কিন্তু মুশকিলে পড়ে ভ্যাবলা। বলে,— "এই রে!—গামছা-টামছা কিছুই তো আনা হয়নি। চান করবো কি কোরে ?"

"কাছে পিঠে লোকজন তো নেই।—কলের আড়ালে চলে যা না!—

আমি ওদিকটায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছি!"—চারিদিক তাকাতে তাকাতে পল্টু বুদ্ধি বাৎলায়।

"কিন্তু⋯ ."

"লজ্জা থাকলে তো চলবে না ভাই। ভূপর্যটকদের কি লজ্জা থাকলে চলে? সামান্য ইজের-জামা কি বলছিস,—যে পথে বেরিয়েছি,—আমাদের যে সব কিছুরই মায়া ত্যাগ করতে হবে ভাই।"—অত্যন্ত মুরুব্বিচালে কথাগুলো বোলেই পল্টু ওধারটায় সরে গিয়ে পাহারা দিতে থাকে। ভ্যাবলা কলের আড়ালে চলে যায়।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে পল্টু। এমন সময় স্টেশনে একটা কুকুর এসে ঢোকে! দিশী কুকুর। তবে চেক্‌নাই আছে। এদিক-ওদিক ঘুরে কুকুরটা পায়ের কাছে এসে জুতো শুঁকতে থাকে।

"আচ্ছা বিপদ তো! এ আপদটা আবার এসে জুট্‌লো কোথা থেকে? হ্যাট্‌-হ্যাট্‌।"—তাড়া দেয় পল্টু। কুকুরটা কিন্তু ওর পায়ের চারপাশেই ঘুরতে থাকে আর ঘেউ ঘেউ করে। দুর ছাই!—পল্টু রেগে-মেগে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে কুকুরটার গায়ে। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ কোরে সরে পড়ে সেখান থেকে।

কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ ও-পাশ থেকে ভ্যাবলার আর্তনাদ ভেসে আসে,—"ওরে বাবারে, আমার জামা-ইজের নিয়ে পালালো পালালো পালালো।"

"কি হয়েছে? কি হয়েছে রে ভ্যাব্‌লা?"—পল্টু তক্ষুণি দৌড়ে আসে।

কলের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভ্যাবলা কেঁদে ওঠে,—"আমার সার্ট আর প্যান্ট মুখে কোরে কুকুরটা পালিয়ে গেল যে। ঐ যে এখনও যাচ্ছে।"

"এই রে!—কি হবে?"—পল্টু ভাবনায় পড়ে।

"তাড়া কর ওর পেছনে।—ছাখো, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি? আমি কি এমনি কোরেই ভূপর্যটনে যাবো নাকি?"

"যদি কামড়ায় ?"—পল্টু ইতস্ততঃ করে।

"একদম কামড়াবে না। আমি বলছি, তুই দেখে নিস্। এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে কুকুরটা ঐ গাছের তলায়। যা, যা। এই ছাখো, আরে দৌড়ে যা শীগ্‌গির।"—ভ্যাবলা তাড়া দেয়।

"কামড়াবে না তুই জানলি কি কোরে?"—পল্টুর ভরসা হয়না তখনো।

"দেখছিলি না, কি রকম ঘেউ ঘেউ কোরে চেঁচাচ্ছিল তখন? 'Barking dogs seldom bite'—মনে নেই তোর সেই ইংরিজি প্রবাদটা?"—ভ্যাবলার অখণ্ডনীয় যুক্তি।

"প্রবাদবাক্যটা তুই না হয় জানিস, আমিও শুনেছি সেকেণ্ড মাস্টারের কেলাসে। কিন্তু ঐ হতচ্ছাড়া কুকুরটা কি জানে মনে করেছিস? ওতো আর সেকেণ্ডমাস্টারের কেলাসে পড়েনি। ঘেউ-ঘেউ কোরে ডেকেও শেষকালে যদি ফস্ কোরে কামড় দিয়ে বসে? মুখ্যু জানোয়ার তো!"—পল্টুর কথাটাও কম ভাববার নয়!

"তাই বোলে আমি কি......?" কান্নায় বাকি কথাটা চাপা পড়ে যায় ভ্যাবলার।

আর কিছু বলতে হয় না। তার আগেই রূপকথার ডালিমকুমারের মতন হাত-মুখ নেড়ে পল্টু বোলে ওঠে,—"চললুম ভ্যাবলা। তোর ইজের আর জামা যদি কুকুরের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি, তবেই ফিরবো,—না হলে...না হলে...না হলে এই শেষ দেখা।"

পল্টু কুকুরের পেছনে দৌড়য়।

বদমাশ কুকুরটা পল্টুকে কিছুক্ষণ চোর-চোর খেলিয়ে সটান স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টারের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

স্টেশনমাষ্টার হরিপদবাবু তখন উঠোনের কলতলায় বোসে মুখে সাবান

মেখে জলের ঘটিটা আর খুঁজে পাচ্ছেন না। চোখ বুজেই হাতড়াচ্ছেন এদিক-ওদিক। সদরে হঠাৎ হুড়মুড় আওয়াজ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন,—"কে রে ?"

পল্টু বল্‌লে,—"আমি।"

"কে তুমি ?"

"সে আপনি চিনবেন না।" আপনাদের কুকুর ভ্যাবলার জামা-ইজের মুখে কোরে পালিয়ে এসে ঐ ঘরটার তক্তপোশের তলায় গিয়ে ঢুকেছে। ভ্যাবলা সেই তখন থেকে ইস্টিশানের কলের আড়ালে···মানে ইজেরটা না পেলে সে বেরোতেই পারছে না যে।" —ভ্যাবলার শোচনীয় অবস্থাটা যতদূর সম্ভব বোঝাবার চেষ্টা করে পল্টু।

মুখে সাবান-মাখা অবস্থায় চোখ বুজেই হরিপদবাবু বলেন,—"একবার এগিয়ে এসে জলের ঘটিটা হাতের কাছে এগিয়ে দাও তো বাবা লক্ষ্মীটি।"

"তা দিচ্ছি,—হাতে কেন, ঘটির জলটা মাথাতেই না হয় ঢেলে দিচ্ছি আমি। কিন্তু ইজেরটা অন্তত বের কোরে দিতেই হবে।" —বলতে বলতে একঘটি জল ঢেলে দেয় পল্টু হরিপদবাবুর মাথায়।

এতক্ষণে হরিপদবাবু চোখ খুলে দেখতে পান পল্টুকে।—"ওঃ, তুমি ? তুমিই না একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলে কলকাতার গাড়ী কখন ছাড়বে ? তা' তোমার সঙ্গে আরেকটি ছোট ছেলেকে দেখেছিলাম,—সেটি কোথায় ?"

"তার ইজের নিয়েই তো পালিয়ে এসেছে আপনার কুকুর।"

"তাই নাকি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ !"

"চলো তো ঘরের ভেতর। দেখি কুকুরটা গেল কোথায় ?"—ভিজে কাপড়েই ঘরের দিকে এগিয়ে যান হরিপদবাবু! তারপর তক্তপোশের তলায় ঢুকে ভ্যাবলার ইজের আর সার্টের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়ে হরিপদবাবুকে পর্যবেক্ষণ করে পল্টু। তক্তপোশের তলায়

জমিয়ে-রাখা বাসনপত্রগুলো ঝন্‌ঝন্‌ কোরে উল্টেপাল্টে যায়। ওপাশের ঘর থেকে হরিপদবাবুর স্ত্রী ব্রজসুন্দরী দেবী হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হন,—"কি হচ্ছে কি ঘরে দুমদাম কাণ্ড?"

## মাসীমা

কিন্তু তাঁর কথায় কান দেবার মতো অবসর নেই কারুরই। হরিপদবাবু তখন খাটের তলায় অন্ধকার থেকে কি একটা ছুঁড়ে দিয়েছেন,—'এই টা?'

'দূর, এটা কেন হতে যাবে?' পল্টু ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটাকে।—'এটাতো একটা ছেঁড়া ফতুয়া।'

ততক্ষণে আর একটা কি ছুঁড়ে দিয়েছেন হরিপদবাবু। এবারে ভ্যাবলার ইজেরটাই সত্যি। তারপর সার্টটা হাতে নিয়ে হরিপদবাবু গুড়িসুড়ি মেরে বেরিয়ে আসেন খাটের তলা থেকে। বেরিয়েই চোখ পড়ে স্ত্রী ব্রজসুন্দরীর দিকে। হেসে উঠে বলেন,—'তোমার কুকুরের কাণ্ড।'

ওদিকে স্টেশনের কলের আড়ালে একা দাঁড়িয়ে ভ্যাবলা বোকা-বোকা কাঁদো-কাঁদো চোখে এদিক-ওদিক তাকায়। পল্টুটা যে কোথায় গেল?

—হঠাৎ স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টারের ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে আসে।

* * *

হরিপদবাবু আর ব্রজসুন্দরী দেবীর হাসিটা বরদাস্ত হয় না পল্টুর একটু চটেই বলে,—'হাসবার কি আছে এতে? আমাদের কাছে গামছা

টামছা নেই বোলেই না······। আমার কুকুর হ'লে অমন কুকুরকে আর বাড়িতেই ঢুকতে দিতুম না।'

'আমিও দেব না ঢুকতে। অমন কুকুর মানুষে পোষে? ছিঃ!'—ব্রজসুন্দরী দেবী পল্টুকে সমর্থন করেন। তারপর হেসে বলেন হরিপদবাবুকে,—'যাও, তুমি জামা-ইজের নিয়ে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এসো এখানে। আমি ততক্ষণ এর সঙ্গে একটু গল্প করি।'

কিছুক্ষণ বাদেই বিস্মিত ভ্যাবলাকে নিয়ে হরিপদবাবুর পুনরাবির্ভাব ঘটে। কোয়ার্টারের দাওয়ায় বোসে তখন ব্রজসুন্দরী পল্টুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। দরজা দিয়ে ভ্যাবলাকে ঢুকতে দেখেই পল্টু এক লাফে তার কাছে গিয়ে আলাদা টেনে নিয়ে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে ফিসফিস কোরে বলে—'এই, আমাদের বাবার হুটো বিয়ে, বুঝলি?'

'বাবা!'—চমকে ওঠে ভ্যাবলা। পল্টুটা পাগল হয়ে গেল নাকি?

'আঃ, শোন্না যা বলি।—আমাদের বাবার হুটো বিয়ে। আমরা হুটি ভাই। সৎমা আমাদের ভারী পাজী। আমাদের বড্ড কষ্ট দেয়। বাবা সৎমাকে খু-উ-ব ভয় করেন। সৎমা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই যেদিকে হুচক্ষু যায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা হুটি ভাই। বুঝলি?'—পল্টু গড়গড় কোরে বোলে যায়।

'সে কী রে!'—ভেবড়ে যায় ভ্যাবলা।

'আহা বুঝলি না?—সেই যে সেই গল্প পড়েছিলুম লাল-মলাটের বইটাতে? সেইটেই হুবহু বোলে দিয়েছি মাস্টারমশায়ের বৌকে। নৈলে আসল কথা জানতে পারলে কি আর রক্ষে ছিল? এতক্ষণে খবর চলে যেত সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে, হুঁ।—

ভ্যাবলা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। পল্টুর বুদ্ধির তারিফ্ কোরে চোখহুটো বড় বড় কোরে বলে,—'ঠিক আছে।'

সকালের ভাত খাওয়াটা ওদের স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টারেই সমাধা হয়। ওরা বেশ টের পায়,—এমন রান্না জীবনে খায়নি কোনোদিন। এমন কি ঐ যেদিন ওদের আশ্রমে জমিদারবাবু এসেছিলেন পরিদর্শন করতে,—আলু পড়েছিল পাতে,—মাছ ছিল বাটিতে,—সেদিনও নয়।

রান্নাঘরের সামনের ফালি রকে পাশাপাশি খেতে বসেছেন হরিপদবাবু, পল্টু আর ভ্যাবলা। পরিবেশন করছেন ব্রজসুন্দরী। খেতে খেতে হরিপদবাবু লক্ষ্য করেন ভ্যাবলা মাছের মুড়োটাকে ঠিক বাগিয়ে খেতে পারছে না। স্ত্রীকে ডেকে বলেন,—'ওগো এদিকে এসে ঐ খোকাটির মাছটা একটু বেছে দাও তো।'

ভ্যাবলা নিয়ম-রক্ষার মতো কোরে দু-একবার না-না বোলে চুপ কোরে যায়। ব্রজসুন্দরী মাছ বেছে দিতে থাকেন। ভ্যাবলা কাঁচুমাচু মুখে একবার পল্টুর দিকে তাকায়। তাচ্ছিল্যের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পল্টু নিজের খাবারে মন দেয় আবার।

দুপুর গড়িয়ে আসে। দেওয়ালঘড়িতে ঢংঢং কোরে দুটো বাজে। ক্যাম্বিসের ডেক-চেয়ারে হরিপদবাবু চক্ষু বুজে শুয়েছিলেন। ব্রজসুন্দরী তাকের ওপর থেকে খাতা-চাপা-দেওয়া মিছরির জলের গেলাসটা এনে ধরেন হরিপদবাবুর সামনে।

মিছরির জল আর দুটো পান খেয়ে ফতুয়াটি কাঁধে ফেলে হরিপদবাবুকে আবার বেরুবার উপক্রম করতে হয়। জিজ্ঞেস করেন,—'সেই ছেলে দুটি কোথায়?'

'ওঘরে ঘুমোচ্ছে অকাতরে। আহা, কতো কষ্টই না হয়েছে বলোতো? বাপটা কি রকম গা? সৎমার হাতে তুলে দিলে অমন ছেলে দুটিকে?'—

নিঃসন্তান ব্রজসুন্দরীর চোখদুটো ছলছল কোরে ওঠে স্নেহে। পল্টুর বানানো গল্প বিশ্বাস করে ফেলেছেন উনি।

'তুমি আর কি করবে বলো?—যাক, মিনিট পনরো বাদে ওদের ডেকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিও।'

'কেন?'

'কেন কি?—ওরা যে দুটো-চল্লিশের গাড়ীতে কলকাতায় যাবে।'

'আজকেই?'

'কি যে তুমি পাগলের মত বকছো।'

'বলছিলুম কি……' ইতস্ততঃ করেন ব্রজসুন্দরী।

'বলো?'

'আজকের দিনটা ওরা যদি আমাদের এখানে থাকে?'

'তা তোমার কচ্ছে হয়, থাক না। কিন্তু ওরা রাজী হবে কেন?'

'ওরা তো ঘুমোচ্ছে।'

'বেশ।—চলি।—দাও, আর একটা পান দাও, যাই।'

ভ্যাবলাটা খেয়ে-দেয়ে পরিপাটি বিছানা পেয়ে সত্যিই অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। পল্টুর ঘুম কিন্তু ভেঙ্গে গেছে কিছুক্ষণ হল। ভূপর্যটনের সবখানি দায়িত্বই তো তার ওপর কিনা!—হরিপদবাবুকে ঘরের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে তড়াক কোরে লাফিয়ে ওঠে ও। ঘরের বাইরে এসে পাকড়াও করে হরিপদবাবুকে,—'যাচ্ছেন ইস্টিশানে? ভ্যাবলাকে তুলে দিই? কলকাতায় যাবার যে গাড়ীটা আসবে, তারই টিকিট কেটে দেবেন দুটো, য়্যাঁ? কত পয়সা লাগবে বলুন তো?'—পল্টু প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকায়।

পল্টুর হাতমুখ নেড়ে কথা বলার ভঙ্গীটুকু উপভোগ করতে করতে হরিপদবাবু বলেন,—'সে আমি সস্তায় কোরে দেব'খন। আসল ভাড়া

অবিশ্যি দেড়টাকা। আমিই তো টিকিট বিক্রি করি। আমার কাছে অমন কতো হাজার হাজার টিকিটই তো রয়েছে। ও আর ছাপাতে আমার কিই বা খরচ লাগে বলো না ?—তাই থেকেই তুখানা দিয়ে দোব তোমাদের।'

'তাহলে কখন যাবো আমরা ?'

ইতিমধ্যে ব্রজসুন্দরী বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। পল্টুর পেছনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি ইশারা করেন তিনি হরিপদবাবুকে। ঘাড় নেড়ে ইশারায় সায় দিয়ে হরিপদবাবু পল্টুকে বলেন,—'মিনিট দশেক পরেই এসো।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই পল্টু আর ভ্যাবলা স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়। হরিপদবাবু তখন টেলিগ্রাফের যন্ত্রটি থেকে টরে-টক্কার খবর শুনছিলেন। শোনা হয়ে যেতেই ওদের দিকে ফিরে অত্যন্ত বিমর্ষ-কণ্ঠে বললেন,—'নাঃ, হোলো না।'

'কি হল না ?'

'তোমাদের যাওয়া।'

'কেন ? কেন ?'

'এইমাত্র টরেটক্কার খবর এলো যে কলকাতার রেলগাড়ীটা যে-ড্রাইভারের চালাবার কথা ছিল, তাদের ক্লাবের আজ ফুটবল খেলা আছে, কাজেই কলকাতার গাড়ী আজ আর চলবেই না।'

'তাহলে কি হবে ?'—পল্টু আর ভ্যাবলা নিতান্তই মুষড়ে পড়ে।

'কি আর হবে। আজকের রাতটা আমাদের বাড়ীতেই থেকে যাও। তারপর কাল তুপুরের গাড়ীতে যেয়ো'খন কলকাতায়। উপায় কি বলো ? ফুটবল ম্যাচ ছেড়ে ড্রাইভার তো আসতে পারে না।'

'কাল ঠিক আসবে তো ?'—পল্টুর যেন ভরসা হয় না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ফাইন্যাল খেলা কিনা আজকে। আজকেই তো ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে।'—হরিপদবাবু আশ্বস্ত করেন ওদের।

'আর, যদি ম্যাচ ড্র হয়ে যায় আজ ?'—ভ্যাবলার হঠাৎ শঙ্কা হয়।

হোহো কোরে হেসে ওঠেন হরিপদবাবু। সত্যিই বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন! বলেন,—'তাহলেও আমি যে কোরে হোক তোমাদের কাল কলকাতায় পৌঁছবার ব্যবস্থা কোরে দেব।'

এরপর আর কিই বা বলবার থাকতে পারে ? পল্টু আর ভ্যাবলা আবার স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টারের দিকে ফিরে যায়। কিন্তু ভূপর্যটনের জন্যে পা যাদের ছটফট করছে,—চুপ কোরে বসে থাকতে তাদের কি ভাল লাগে ?

'চ পল্টু, ততক্ষণ ঘুরে ফিরে এই দেশটাকেই দেখা যাক খানিকক্ষণ।'—ভ্যাবলা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

'তাই চ।'—পল্টুর সম্মতি দিতে একটুও দেরি হয় না। দুজনে এগোতে থাকে।

বিকেল চারটে বেজে গেছে। ঘরের সামনের ফালি বারান্দায় স্টোভ জ্বেলে হরিপদবাবুর স্ত্রী তখন পরোটা ভাজতে বসেছেন। গা ধোওয়া হয়ে গেছে সেই সাড়ে তিনটেয়। হরিপদবাবু ঢোকেন। চটির শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে হরিপদবাবুর স্ত্রী বলেন,—'সেই ছেলে দুটি কোথায় ?'

'কেন ? আসেনি এখানে ?'

'কই, না তো !—আমি তো জানি তোমার ওখানেই আছে।'

'বাঃ, আমার ওখান থেকে তো কখন চলে এসেছে।'

'কী মুশকিল।—গেল কোথায় তাহলে তারা ?'

বলতে বলতেই তাদের আবির্ভাব হয়। হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে ঢুকতে দুজনেই প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে,—'মাস্টারমশাই, ওঃ কী ফাইন !'

'কি ফাইন ? কিসের ফাইন ? হাঁপাচ্ছ কেন তোমরা ?'—ব্রজসুন্দরী ব্যস্ত হন।

'ওঃ, কী গ্র্যাণ্ড ঘোড়া তৈরি করছে একটা লোক।'—বিস্ময়ে আর খুশীতে চোখমুখ ওদের উপছে পড়ছে তখন।

'ঘোড়া?—তৈরি করছে?'

'তাও তো আমরা সবখানি দেখতে পাইনি মাস্টারমশাই। আমরা যখন দেখলুম, তখন সব তৈরি হয়ে গেছে, ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর চারটে তৈরি হচ্ছে কেবল। হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে পেরেক আঁটছে তখন লোকটা। ওঃ, কী সুন্দর ঘোড়া মাস্টারমশাই! আমাদের গ্রামের কড়িমিঞার ঘোড়ার চেয়ে হাজার-গুণে ভাল।'—পল্টু গড়গড় কোরে বলে যায়।

'আমরা আগে জানতুম,—মানুষ, গোরু, ছাগল, বেড়ালের মতন ঘোড়াও বাচ্চা হয়ে জন্মায়,—তাই নারে পল্টু? আমাদের ফট্‌কে বোলে একজন বন্ধু ছিল,—সে বলতো, হাঁস-মুরগীর মতন ঘোড়াও নাকি ডিম থেকে বেরোয়;—মনে আছে তোর পল্টু?'—বলতে বলতে ভ্যাবলা হাঁপিয়ে ওঠে।

'তা' আজ কি জানলে তোমরা?'—সকৌতুকে জিজ্ঞেস করেন হরিপদবাবুর স্ত্রী।

'কি আবার।—মানুষে ঘোড়া তৈরি করে। দেখলুম তো নিজেদের চক্ষেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ইস্, আর একটু আগে যদি যেতে পারতুম রে, তাহলে সবখানি দেখতে পেতুম কি কোরে ঘোড়া তৈরি করে। আমরা অনেক পরে গেছলুম কিনা,—তখন মুখ-ঘাড়-ন্যাজ-চুল-পা-টা স-ব তৈরি হয়ে গেছে,—পায়ের ক্ষুর তৈরি করাটাই তাই দেখতে পেলুম শুধু।—আপনারা নিশ্চয়ই অনেক ঘোড়া তৈরি দেখেছেন? একেবারে গোড়া থেকে সবখানিই দেখেছেন তো?—আচ্ছা, মুণ্ডুটা তৈরি করাই সবচেয়ে শক্ত,—না?'

অতি কষ্টে হাসি চাপা দিয়ে হরিপদবাবুর স্ত্রী বলেন,—'হ্যাঁ। কিন্তু তার চেয়েও শক্ত ল্যাজটা তৈরি করা।'

'দুর্ ও আর এমন কি শক্ত? ঠাকুরঘর থেকে একটা চামর এনে লাগিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়।'—ভ্যাবলা ঘোড়ার ল্যাজকে মুণ্ডুর চেয়েও প্রাধান্য দিতে রাজী নয়।

'দুর্, চামর তো অনেক বেঁটে হয় রে। ঘোড়ার ন্যাজ কতো লম্বা হয় দেখিস নি?'—ভ্যাবলার ভুলটা শুধরে দেওয়া কর্তব্য মনে করে পল্টু,—'ঐ অতোগুলো বালামচি একসঙ্গে জড়ো কোরে বেঁধে ফিট করা কি চাড্ডিখানি কথা?'

ফতুয়ার পকেট থেকে ঘড়িটা বের কোরে হরিপদবাবু হেসে বলেন,—'আচ্ছা, ঘোড়ার ল্যাজ নিয়ে পরে টানাটানি করা যাবে এখন। এসো, এখন পরোটা খেয়ে নাও গরম গরম। কই গো,—আমায় চা দিও এক কাপ, আর কিছু খাবো না এখন।'

চা খেয়ে হরিপদবাবু আবার স্টেশনে ছোটেন। ওরা খেতে বসে। ব্রজসুন্দরী গরম গরম পরোটা ভেজে ভেজে পরিবেশন করেন। গুড় আর পরোটা, আর তার সঙ্গে একটু আমের আচার। ব্রে লাগে কিন্তু।

খেতে খেতে ভ্যাবলা হঠাৎ বোলে ওঠে,—'শুনছেন?'

'কি চাই? পরোটা আর একখানা?'

'না, না,—এই পল্টু বলছিলো যে,⋯ ⋅ '

'বারে, তুই তো আগে বললি।'

'তারপরে তো তুইও,—তুইও তো বললি।'

হেসে ফেলেন ব্রজসুন্দরী ওদের রকম-সকম দেখে। বলেন,—'আচ্ছা, আচ্ছা, দুজনেই বলেছ। কিন্তু কথাটা কি?'

'আচ্ছা, আমের আচার কি কোরে রাঁধে?'—ভ্যাবলা রেকাবিটা চাটতে চাটতে বলে।

এবার আর থাকতে পারেন না ব্রজসুন্দরী। হেসে সস্নেহে ভ্যাবলাকে কোলের কাছে টেনে এনে মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলেন,—'তবু

বলবে না যে, মাসীমা আর একটু আমের আচার দিন, খাবো।—ছুষ্টু ছেলে কোথাকার।'

ভ্যাব্লা বোকার মতো বলে,—'পল্টু যে বললে, হ্যাংলার মতন চাইতে নেই।'

ব্রজসুন্দরী হেসে ফিরে তাকান সলজ্জ পল্টুর দিকে। মুচ্কি হেসে বলেন,—'ওঃ, পল্টুবাবু একেবারে মস্তবড় বুদ্ধিমান!—বোকা কোথাকার। —মাসীমার কাছে লজ্জা করতে আছে নাকি?'

রাত হয়ে গেছে বেশ। পল্টু আর ভ্যাবলা ব্রজসুন্দরীর কাছে কতো গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে এইমাত্র। পাখা দিয়ে মশা তাড়িয়ে বিছানার চারদিকে সযত্নে মশারি গুঁজে হ্যারিকেনটা কমিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ব্রজসুন্দরী দেবী। চুপটি কোরে দাঁড়ালেন একা অন্ধকার রকের ধারে কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে।

কাল চলে যাবে এই ছুটি ছেলে। আহা, বেশ ছেলে ছুটি। আজ কোঁথা দিয়ে দিনটা যেন কেটে গেছে ব্রজসুন্দরীর হৈ-হৈ কোরে। কিন্তু কাল? কাল যখন চলে যাবে ওরা?—আবার সেই একঘেয়ে জীবন। সময় আর কাটতে চাইবে না।—নিজের হাতের একরাশ মাতুলির দিকে তাকালেন ব্রজসুন্দরী। কতো মাতুলিই তো দিলে কতোজনে। তবু তো এলোনা কোলে একটিও।

অনেকক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে ব্রজসুন্দরী কি ভাবেন। তারপব হঠাৎ ঘরে ঢুকেই হরিপদবাবুকে বলেন, 'ওরা কাল যাবে না।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ।—ভগবান আমাদের যেমন ছেলেপুলে দেননি, তেমনি ওদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওদেরই মানুষ কোরে তুলবো আমরা।'—অবিচল ব্রজসুন্দরীর কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু ওদের মা-বাপ আছেন যে।'

'মা কোথায়? সৎমা!—সেই সৎমাই তো তাড়িয়ে দিয়েছে ওদের। বাপও কি আর খোঁজ নেবে ভেবেছো? না, না,—আমি কোনো কথা শুনবো না,—ওরা এখানে থাকবে,—চিরকাল থাকবে—চিরকাল থাকবে।'

পরদিন সকালবেলা হরির মা এল দুধ দিতে। ব্রজসুন্দরী বললেন,—'আধসের বেশি দিস্ বাছা দুধ।—দুবেলাই এবার থেকে আধসের কোরে দুধ বেশি দিবি,—বুঝলি?' তারপর দুধের কড়া তুলে নিয়ে চাপিয়ে দিলেন উনুনে। জল ঢাললেন তাতে কিছুটা। কাঠের চৌকিতে বোসে উনুনে পাখার বাতাস দিতে দিতে ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন,—'কৈ? দাঁত মাজা হোল তোমাদের?'

মুখ ধুয়ে ওরা এসে বসলো মাসীমার পাতা পিঁড়ি দুটোতে। ব্রজসুন্দরী মুড়ি-নারকেলের দুটি বাটি এগিয়ে দিলেন ওদের সামনে। খেতে লাগলো ওরা।

সকালের জলখাবার খেয়ে ওরা দুটিতে বেরোলো মাসীমাদের দেশটা আরো একটু ভাল কোরে দেখতে। পাড়াগাঁয়ের মাটির রাস্তা। গল্প করতে করতে ওরা এসে বসলো মাঠের ওপর একটা গাছের ছায়ায়। চুপচাপ বোসে থাকতে থাকতে পল্টু এক সময় বললে,—'আজই তো আবার দুপুরের গাড়ীতে চলে যেতে হবে কলকাতায়।'

'আজই?' ভ্যাবলা জেনে শুনেও যেন কথাটা নতুন কোরে শোনে।

'হ্যাঁ। কেন?'

'না। তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'তোর বুঝি থাকতে ইচ্ছে করছে এখানে?'—পল্টু প্রশ্ন করে।

'না, না।'—ভ্যাব্লা তাড়াতাড়ি বোলে ওঠে।

'আমার করছে।'—পল্টু আর লুকোয় না মনের কথা।

শুনে উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে ভ্যাবলা। মনের যে কথাটা লজ্জায় বলতে পারছিল না,—এবার সেটা বলতে আর বাধা থাকে না। বলে,—'আমারও।'

'কিন্তু'—পল্টু ঠিক ভরসা করতে পারে না,—'আমাদের থাকতে দেবেন কেন এঁরা?'

'কিন্তু আমাদের কতো ভালবাসছেন যে মাসীমা!'—ভ্যাবলা নিজেকেই নিজে ভরসা দেয়।

'ধর, হরিপদবাবু যদি আজকের জন্যে আমাদের রেলগাড়ীর টিকিট তৈরি করিয়ে রেখে থাকেন?'— পল্টু আবার মন্দর দিকটা ভাবে।

'তাহলে চলে যাব।'—ভ্যাবলার চোখদুটো যেন ছলছল কোরে ওঠে,—'চলে যাব তাহলে।—কিন্তু হরিপদবাবু ভুলেও তো যেতে পারেন? ভুলে গেলে তুই যেন আবার মনে করিয়ে দিতে যাসনি।'

ভ্যাবলার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পল্টু চেঁচিয়ে ওঠে,—'এই, এই—দ্যাখ দ্যাখ।'

মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় জল-ছড়ানোর গাড়ী যাচ্ছিল একটা। ঘোড়ায়-টানা গাড়ীর ওপর প্রকাণ্ড একটা জলের ট্যাঙ্ক বসানো। তার তলায় এক লাইনে অনেকগুলো ফুটো দিয়ে ছরছর কোরে জল পড়ছে,—রাস্তার ধুলোকে ভিজিয়ে দেবার জন্যে। সেই দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় পল্টু। ভ্যাবলা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যায় গাড়ীর কাছে। গাড়ীর পাশে পাশে দৌড়তে দৌড়তে বলে,—'এই গাড়োয়ান, ও কচুয়ান ভাই, তোমার সব জলই যে ট্যাঙ্কে ফুটো হয়ে গিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রাস্তায়! ভাগ্যিস্ আমি দেখলুম।'

'যাক্‌গে বেরিয়ে।'—গাড়োয়ান মুচকি হেসে জবাব দেয়।

'আহা একটু-আধটু নয় গো। একেবারে হুড়হুড় কোরে অনেকখানি

জল বেরিয়ে যাচ্ছে যে। গাড়ী থামিয়ে নেমে এসে ছ্যাখোই না একবার।' —ভ্যাবলা আবার বলে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু গাড়োয়ান গেরাহ্যিই করে না একদম!

পল্টু সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে হাঁ কোরে। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসে ভ্যাবলা হাঁপাতে হাঁপাতে। পল্টু বলে,—'কি রে? কি বললো গাড়োয়ান?'

'বললে, ইচ্ছে কোরেই নাকি ফুটো কোরে দিয়েছে ট্যাঙ্কে। কিন্তু কেন বল দিকিনি পল্টু? জল বের কোরে লাভ কি ওর? জল কি ওর কোন ক্ষতি করছিল? ক্ষতিই যদি করছিল, তবে সাধ কোরে ট্যাঙ্কেতে জল ভরাই বা কেন?—কিছুই বুঝি না বাপু।'

ছুজনকেই অত্যন্ত চিন্তান্বিত দেখায়। তারপর হঠাৎ এক সময় পল্টু কারণটা আবিষ্কার কোরে ফ্যালে,—'ওহোঃ, বুঝতে পেরেছি এতক্ষণে। লুকিয়ে লুকিয়ে ছুষ্টু ছেলেরা যাতে না গাড়ীর পেছনে বোসে যেতে পারে, তাই জন্যে করেছে।'

"ঠিক বলেছিস্ তুই।"—পল্টুর বুদ্ধির প্রখরতা ভ্যাবলাকে বিস্মিত করে। ভ্যাবলা তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পল্টু সগর্বে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে। তারপর আবার চলতে থাকে।

ছু-চার পা গিয়েই নিজের মনেই হঠাৎ হিহি কোরে হেসে ওঠে ভ্যাবলা। পল্টু জিজ্ঞেস করে,—"কিরে, হঠাৎ হেসে উঠলি যে বড়?"

ভ্যাবলা হাসতে হাসতে বলে,—"আমাদের আশ্রমের ফটকে কিংবা নিতাই সেই কড়িমিঞার ঘোড়ার-গাড়ীর মতন এই গাড়ীর পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বসতে গেলে কি হোতো বল দিকিনি?—প্যাণ্ট-ট্যাণ্ট ভিজে একেবারে·· ···"

বাকি কথাটা আর শেষ হয় না। মনে মনে প্যাণ্ট ভিজে-যাওয়া ফট্‌কে আর নিতাই-এর কাঁচমাচু মুখতুটো ভেবে হেসে ওঠে ভ্যাবলা আবার। পল্টু বলে,—"এই চ,'—মাসীমা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছেন,—দেরী হয়ে গেলে রাগ করবেন শেষকালে।"

সন্তানহীনা ব্রজসুন্দরীর আদর-যত্নে দিন কেটে যায় পল্টু ও ভ্যাবলার। একদিন তুদিন কোরে দশ দিন। পিসার টাওয়ার কিংবা ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান, কোনোটাই আর তেমন কোরে আকর্ষণ করতে পারে না পল্টু ও ভ্যাবলাকে! তার চেয়ে ঢের-ঢের ভাল লাগে অনাদরে-অযত্নে পালিত এই তুটি ছেলের কাছে মাসীমার ভালবাসা!

সেদিন তুপুরে দাওয়ার সিঁড়িতে তুপাশে পল্টু ও ভ্যাবলাকে নিয়ে বোসেছিলেন হাস্যমুখে ব্রজসুন্দরী। কোয়ার্টারের উঠোনে বুড়ো একটি বৈরাগী তার একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে গান ধরেছে,—

তোরে দেখতে এলাম নন্দরাণী।
(ও তোর) উজল হল গৃহখানি॥
কানাই-বলাই তুই কোলে তোর,
রূপ দেখে মোর নয়ন বিভোর
(আজ) আনন্দেতে নীল যমুনার বইছে চোখে সুখের পানি॥
তোরে দেখতে এলাম নন্দরাণী॥

শুনতে শুনতে তুহাত দিয়ে তুজনকে জড়িয়ে ধরেন ব্রজসুন্দরী সস্নেহে।

এমন সময় পান চিবোতে চিবোতে সরকারদের মেজবৌ এসে ঢোকেন, —"বলি ও মাস্টারদি, আমাদের কি একেবারেই ভুলে গেলে?"

"সে কি কথা ভাই, ভুলবো কি?"—ব্রজসুন্দরী উঠে হাত ধরেন তাঁর হাসিমুখে।

"ভোলার আর বাকি কি ভাই? আজ দশদিন তুমি আমাদের বিস্তির আড্ডাই মাড়াওনি।"—অভিযোগ জানান সরকারদের মেজবৌ।

অভিযোগ মিথ্যে নয়। সেদিন চৌধুরী-পিসী এসেও তুঃখু কোরে গেছেন।—"হ্যাঁরে মাস্টারবৌ, পাঁচদিন কথকতা দিলুম বাড়িতে। বামনাবতার পালা। বোলে পাঠালুম। তা' একদিনও যেতে পারলিনে?"

"সময় পাই না চৌধুরী-পিসী! সন্ধ্যে থেকে ছেলে তুটো খাসী-মাসী কোরে এমন আব্দার করে যে,—"

"পরকালের কড়ি, সে কি তোর বোনপোরা দেবে যোগাড় কোরে?" —বর্ষিয়সী চৌধুরী-পিসী তত্ত্বোপদেশ দেন। সবাই জানে পল্টু ও ভ্যাবলা ব্রজসুন্দরীর সত্যিকারের বোনপো।

ব্রজসুন্দরী অত্যন্ত কুণ্ঠিতস্বরে বলেন,—"সবই তো বুঝি চৌধুরী-পিসী; কিন্তু ওদের যে মা নেই।"

"মায়ার বাঁধন যে কখন কোথা থেকে আসে মাস্টারবৌ!"—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন চৌধুরী-পিসী। জীবনে অনেক ঘা খেয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর।—"এই ছাখ তুই কেমন ছিলি ঝাড়া হাত-পা,—কোথায় ছিল তোর বোন,—হঠাৎ মরে গেল—বোনপো তুটো এসে পড়লো তোর ঘাড়ে। বাঁধন আলগা করবার চেষ্টা করিস মাস্টারবৌ—নৈলে পরে বড় তুঃখু পাবি।"

একথা হরিপদবাবুও মাঝে মাঝেই বলেন। বলেন,—"ভুলে যেও না, এরা পরের ছেলে। মায়া কম করো। নৈলে কে জানে, পরে যদি তুঃখু পেতে হয়?"

কিন্তু পরে কবে তুঃখ আসবে, সেই কথা ভেবে আজ থেকে বুঝি ভালবাসা কম করা চলে? আর, সবাই ওদের পরের ছেলেই বা ভাবে কেন? একথা কি ভাবা যায় না যে, ওরা ব্রজসুন্দরীরই ছেলে? ব্রজসুন্দরীর নিজের তো অন্তত একথা ভাবতে একটুও অসুবিধে হয় না।

আর তাই তো সন্তানহীনা ব্রজসুন্দরী তার হাতের দৈব মাদুলি আর কবচগুলো খুলে ফেলেছেন এতদিনে। আর কিসের দরকার তাঁর মাদুলির ? আজ যে তিনি দুই ছেলের মা !

দিন কুড়ি কেটে গেছে। সকালবেলা দাওয়ায় বোসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা খাওয়া শেষ কোরে উঠে স্টেশনের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন হরিপদবাবু। রান্নাঘরের দোরের দিকে উঁকি মেরে ব্রজসুন্দরীকে জিজ্ঞেস করলেন,—'হ্যাঁগা,—সকাল থেকে ছেলে দুটোকে দেখছি না যে ?'

'ও, ছেলেরা ?'—ঘটির জলে হাত ধুয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন ব্রজসুন্দরী।—'মল্লিকপুকুরে জেলেরা আজ টানা-জাল ফেলেছে, তাই দেখতে বেরিয়েছে ওরা। শোনো,—যে বলটা কিনে দিয়েছিলে না তুমি ? সেটার ব্লাডার ফেঁসে গেছে। ছাপরাকে দিয়ে আমি সাইকেল-সারানোর দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছি। হয়ে গেছে বোধহয় এতক্ষণে। দিও তো পাঠিয়ে। আর হ্যাঁ,—তোমার দর্জিকে বাপু ধমক দিও তো আজ একবার। সাত-আট দিন হয়ে গেল, এখনও চারটে জামা ইজের সেলাই হোল না ? বোলো, কাল যেন নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেয়। ছেলেরা কি আমার ঐ এক জামা-কাপড়েই ঘুরবে ?'

'আমি এখুনি লোক পাঠাচ্ছি দর্জির কাছে।'—হরিপদবাবু বেরুবার উদ্যোগ করলেন। তারপর আবার ফিরে এসে বললেন,—'আর হ্যাঁ, দ্যাখো,—ছেলেদুটোকে শুধু আদর দিলেই চলবে না। মানুষ করতে চেষ্টা কোরো ওদের। তবেই না মা।—সকালবেলা রোজ রোজ খেলা করতে না দিয়ে পড়তে বসিয়ো একটু। কেমন ?—আচ্ছা, চলি।'

হরিপদবাবু বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারে বাড়ি মাথায় করতে করতে ঢোকে পল্টু আর ভ্যাবলা।—'মাসীমা, মাসীমা,—আজ স্রেফ কালিয়া !'

ধপাস্ কোরে উঠোনের ওপর একটা জ্যান্ত শোলমাছ ফেলে দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় ওরা। যেন মস্তবড় একটা যুদ্ধ জয় কোরে ফিরেছে,—এমনিধারা ভাবখানা।

'কী সুন্দর শোল ছ্যাখো মাসীমা ;—কী চকচকে গা। এখনও জ্যান্ত রয়েছে কিন্তু।'—পল্টু বাহাদুরীর সুরে বলে।

ততক্ষণে নেমে এসেছেন ব্রজসুন্দরী রান্নাঘরের দাওয়া থেকে। মাছ দেখে হাসিমুখে বললেন,—'কে দিয়েছে রে ? নবীন মল্লিক ?'

'কেউ দেয়নি তো।'

'তবে ?'

'আমরা নিয়ে এলুম। অনেক-অনেক মাছ ধরেছে ওরা মাসীমা। আরো সব বড় বড় মাছ ছিল। সে তো আমরা তুলে আনতে পারবো না, তাই······

স্থির কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে মাসীমা ধমক দিয়ে উঠলেন,—'পল্টু !'

পল্টু বললে,—'কেউ দেখতে পায়নি মাসীমা, একটুও দেখতে পায়নি।'

ভ্যাবলা বললে,—'তুলে নিয়ে চোঁ কোরে পালিয়ে এসেছি।'

মাসীমা আরো কঠিন কণ্ঠে বললেন,—'ভ্যাবলা !'

ভ্যাবলা এবার বেশ বুঝতে পারে,—মাছ আনাটা মাসীমার মনঃপূত হয়নি। করুণ কণ্ঠে বলে, 'ওদের ওখানে তো অনেক মাছ মাসীমা,—একটা নিলে···'

'ফেরত দিয়ে এসো। যাও, এক্ষুণি গিয়ে ফেরত দিয়ে এসো ! ছিঃ,—না বোলে পরের জিনিস নিলে চুরি করা হয়, জানো না ?'

'শুধু তো একটা মাসীমা'—ফেরত দিতে মন-কেমন করে ভ্যাবলার।

'তা হোক—কথা শোনো ; ফেরত দিয়ে এসো এক্ষুণি।'

'যদি ওরা মারে ?'—পল্টুর ভয় ভয় করে।

'মারবে না।—বলবে, আমরা নিয়েছিলুম,—বাড়িতে মাসীমা খুব

বকেছেন, তাই ফেরত দিতে এসেছি। কেউ কিচ্ছু বলবে না তাহলে। যাও,—দেরী করতে নেই, ছিঃ।'

পল্টু আর ভ্যাবলা নেহাত ক্ষুণ্ণমনে মাছটা তুলে নিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে যায় দরজার দিকে। দরজার কাছে গিয়ে আর একবার ফিরে দাঁড়ায় ভ্যাবলা,—'মাছটা থাক না মাসীমা।'

ব্রজসুন্দরী বলেন,—'আমার কথার অবাধ্য হয়ো না।'

ওরা চলে যায়।

বিকেল হয়ে গেছে, চুল বেঁধে ব্রজসুন্দরী কপালে সিঁদুরের টিপ পরছেন,—পল্টু আর ভ্যাবলা এসে দাঁড়ালো। দুজনের গায়েই দর্জ্জিবাড়ি থেকে আনা নতুন চকচকে সার্ট আর প্যাণ্ট। পাশাপাশি সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা বললে,—'এই যে মাসীমা।'

'মন্দ হয়নি। ঝুলটা একটু ছোটো হয়েছে, নারে?'—জামা ইজের টেনেটুনে দেখতে থাকেন ব্রজসুন্দরী।

'না, না,—খুব তো ভাল হয়েছে,—ছোট কই?'—ওদের ভয় করে,—ছোট বললে যদি আবার ফেরত চলে যায় দোকানে।

'তোদের পছন্দ হয়েছে তো?'

'খু-উ-ব।'

'ব্যস, তাহলেই হোল।'

'এবার তাহলে বেড়াতে যাই?—পল্টু আর ভ্যাবলার আর তর সয় না।

'দাঁড়া, দাঁড়া;—চুলগুলো আঁচড়ে দিই। ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস না কি রে বাপু?'—ব্রজসুন্দরী চিরুণী নিয়ে আসেন।

চুল আঁচড়ানো হতে না হতেই ছটফট কোরে ওঠে ওরা,—'এবার তাহলে বেড়াতে যাই?'

'উহুঁ, দাঁড়াও।—দুধ খেয়ে তবে যাবে।'—ব্রজসুন্দরী দুধের কড়া থেকে দুধ আনতে বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে। কিন্তু দুধের বাটি দুটো পাওয়া

যায় না খুঁজে। নিশ্চয়ই খ্যান্তর মার কাজ। দিন দিন বড় আলগা-আলগা কাজ হচ্ছে খ্যান্তর মায়ের। বাটি ছুটো নিশ্চয়ই ভুলে ফেলে এসেছে পুকুর ঘাটে।

ব্রজসুন্দরী দাওয়া থেকে নেমে পুকুরঘাটের দিকে এগিয়ে যান।

যা ভেবেছেন তাই। বাটিছুটো সত্যিই পড়ে ছিল পুকুরঘাটে। কপাল ভাল যে এতক্ষণ রয়েছে বাটিছুটো! চোরের তো আর কমতি নেই কিছু এ-তল্লাটে।

বাটি তুলেছেন সবে ব্রজসুন্দরী—হঠাৎ ঘাটের জলে একটা আওয়াজ হ'ল,—ছলাৎ।

আবার।—ছলাৎ।

কৌতূহল হ'ল ব্রজসুন্দরীর কেমন। নারকেল গাছের গুঁড়ি পাতা ঘাটের কিনারায় নজর করলেন একবার। নজর কোরেই শক্ত কাঠের মতন দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি রাগে এবং ছুঃখে।

সকালবেলাকার সেই শোল মাছটা কানকোয় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ডোবানো রয়েছে পুকুরের জলে!

দূর থেকে পল্টু আর ভ্যাবলা মাসীমাকে অমন কোরে পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোঁ দৌড়!

## চিঠি

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দাওয়ায় হ্যারিকেন জ্বলছে একটা। ব্রজসুন্দরী ভাতের হাঁড়ি উনুনে চাপিয়ে হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন রান্নার জায়গায়। মুখটা থমথমে। পল্টু ও ভ্যাবলার এই অবাধ্যতা ছেলেমানুষী বোলেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হরিপদবাবু

বলেছেন,—শুধু আদরে ছেলে মানুষ হয় না, একটু-আধটু শাসনও দরকার।—কিন্তু কী শাসন করতে পারেন ব্রজসুন্দরী? ঠিক করেছেন,—কথাই কইবেন না আজ ওদের সঙ্গে। ছেলেদের মানুষ করতে হবে তো।

দরজা খোলার শব্দ হ'ল,—ক্যাঁচ্।

ব্রজসুন্দরী মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে বাড়ি ঢুকছে পণ্টু আর ভ্যাবলা। মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

পণ্টু আর ভ্যাবলা আস্তে আস্তে দাওয়ার কোলে এসে দাঁড়াল। ভ্যাবলা আস্তে আস্তে একবার ডাকলো—'মাসীমা।' কোন সাড়া এল না।

ভয়ে ভয়ে ওরা তুটিতে দাওয়ায় উঠে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

একঘণ্টাটাক কেটে গেছে আরো,—কিম্বা তারো কিছু বেশী। ব্রজসুন্দরী সেই একই ভাবে বসেছিলেন চুপচাপ। এবার উঠলেন। পা টিপে টিপে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলেন তুটিতে মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পাশাপাশি। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় মনে হল ভ্যাবলার কচি ঠোঁটতুটো যেন ঘুমের ঘোরে তুবার কেঁপে কেঁপে উঠলো।

চোখে জল এসে পড়ে কেমন যেন ব্রজসুন্দরীর। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢোকেন। কাছে গিয়ে ওদের আদর কোরে ডেকে তুলতে গিয়েই মনে পড়ে যায় হরিপদবাবুর উপদেশ,—'শুধু আদর করলেই চলবে না। ওদের মানুষ করবার ভারও তোমারই। তবেই না মা।'

ব্রজসুন্দরীর আর ডাকা হল না ওদের। ফিরে এলেন তেমনি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে দাওয়ায়। মাথার ওপরকার কালো আকাশের ছোট ছোট তারাগুলি যেন ঘুমন্ত ভ্যাবলার কচি ঠোঁটের মতোই কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে!

রাত হয়ে গেছে। সারাদিনের খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়েছেন হরিপদ-

বাবু। ব্রজসুন্দরী কেবল উসখুস করেন। ওদের শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেকে তার চেয়ে বেশী শাস্ত ভোগ করতে হচ্ছে যে! কখন ভোর হবে?

আরও রাত বেড়ে গেছে। ওঘরে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন ব্রজসুন্দরী! এ ঘরে ঘুম ভেঙ্গে গেল ভ্যাবলার। পল্টু তখনো ঘুমোচ্ছে। ভ্যাবলা ঠেলে দিল পল্টুকে,—'পল্টু, এই পল্টু।'

'কিরে?—কত রাত এখন?'

'অনেক।—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে পল্টু।'

'কি করবি বল?'

'মাসীমাকে ডাকবো?'

'না রে।'

'কেন?'

'মাসীমা খু-উ-ব রেগে গেছেন আমাদের ওপর। আমরা মাসীমার কথা শুনিনি কিনা।'

ও।'—ভ্যাবলা চুপ করে যায়। তারপর কান্না-কান্না গলায় জিজ্ঞেস করে,—'আর ভালবাসবেন না?'

'না।'

'তবে কি হবে?'—বলতে বলতে কেঁদে ফেলে ভ্যাবলা।

'চ এখান থেকে পালাই।'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ এখুনি।'

'মাসীমা আমাদের একবারো খেতে ডাকলেন না কেন রে?' ভ্যাবলা তখনও ভেবে উঠতে পারছে না, মাসীমা এতখানি নিষ্ঠুর হলেন কি কোরে।

পল্টু শুধু বললে,—'খুব রেগে গেছেন যে।'

'চ তাহলে।—এক্ষুণিই পালিয়ে চ এখান থেকে।'—এত তাড়াতাড়ি

যেখানে ভালবাসা শেষ হয়ে যায়, ভ্যাবলা আর সেখানে থাকতে রাজী নয়।

'একটা চিঠি লিখে রেখে যাই মাসীমাকে।'—পল্টু বলে

'কি লিখবি?'—ভ্যাবলার মাথার মধ্যে সব যেন কান্নারা এসে ভিড় জমায়।

চিঠি লেখে দুজনে। ছোট্ট চিঠি।—"মাসীমা গো, আর কখ্খনো চুরি করবো না আমরা। খুব ভাল ছেলে হব। পৃথিবীর সবখানি ঘুরে এসে যখন আমাদের অনেক-অনেক টাকা হবে, তখন আবার ফিরে আসবো মাসীমা তোমার কাছে! আমাদের বাবা নেই তো মাসীমা,—মাও নেই,—সব মিছে কথা বলেছি তোমার কাছে এতদিন।—মিছে কথাও আর বলবো না কোনদিন মাসীমা। অনেকদিন বাদে আবার যখন আমরা আসবো, তখন আর রাগ কোরে থাকবে না তো মাসীমা,—আবার ভালবাসবে? আবার আদর করবে?"

চিঠি লেখার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, রাতের অন্ধকারে স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টারে সদর দরজায় পল্টু ঘোড়ার মতন দুহাতে-দুপায়ে দাঁড়িয়ে আছে,—আর ভ্যাবলা তার পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে দরজার ছিটকিনি খুলছে।

ছিটকিনি খুলে সেই অন্ধকারেই তারা মিলিয়ে গেল কোথায়! শুধু ব্রজসুন্দরীর ঘরের চৌকাঠে পড়ে রইলো তাদের সেই নতুন প্যাণ্ট আর সার্ট;—আর তাদের সেই চিঠি,—'আবার ভালবাসবে? আবার আদর করবে?'

## আবার রেলগাড়ী

ভোর তখনো হয়নি। রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা তখনো। কারুর মুখে কথা নেই। পল্টু একবার বললে শুধু,—'মন কেমন করছে, নারে?'

ভ্যাবলা কথা বললে না কোনো,---শুধু মাথা নেড়ে জানালে হ্যাঁ।

'আবার তো ফিরে আসবো আমরা।'—পল্টু আশ্বাস দেয় ভ্যাবলাকে।

'সে তো অনেকদিন পরে।'

'পরে আর এমন কি বল্। এখন যাবো ধর্ কলকাতায় তো।'

'তারপর?'

'তারপর···তারপর···কি জানি, কলকাতা থেকে চীনের প্রাচীর না পিসার টাওয়ার, কোন্‌টা কাছে হয় কে জানে?'—

অনেকটা দূরে মাঠের একেবারে শেষে তালগাছের ঘেঁষাঘেঁষির পেছন থেকে সূর্য উঠছেন। কী লাল, আর কত বড় সূর্য! রোদ্দুরের লাল রং তালগাছের মাথা ছাড়িয়ে মাঠে নেমে দৌড়োতে দৌড়োতে ছুটে এসে লাগলো যেন পল্টু আর ভ্যাবলার চোখে-মুখে, জামায়-ইজেরে। ফুরফুর কোরে সকালের হাওয়া দিচ্ছে। টেলিগ্রাফের তারে ফিঙের দল ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে আছে। ওধারে কোথায় কোন্ গাছের আড়ালে কত পাখীই যে ডেকে উঠছে!

বড্ড ভাল লেগে যায় ওদের আজকের এই সকালটাকে। সরস্বতী পুজোর দিনের সকালবেলা ছাড়া এমন সুন্দর এমন মিষ্টি সকাল এর আগে ওরা আর কখনো দেখেনি।

'এই, সূর্য ঠাকুরকে নমস্কার কর্।'—পল্টু ভ্যাবলার দিকে ফিরে

বলে। দুজনে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে একটুর জন্যে। তারপর মাথা হেঁট কোরে প্রণাম জানায় নবোদিত সূর্যদেবকে। তারপর আবার এগোতে থাকে।

'আরে আরে আবার একটা ইস্টিশান এসে গেল যে রে এরি মধ্যে। কতক্ষণই বা হেঁটেছি আমরা।'—পল্টু আনন্দে লাফিয়ে ওঠে,—'এইবার সটান্ কলকাতা, কি বল ভ্যাবলা ?'

ভ্যাবলা তখন তাকিয়ে আছে নতুন স্টেশনের কোয়ার্টারের' দিকে। ওদিকের ঐ কোয়ার্টারটা ঠিক যেন মাসীমাদের বাড়ির মতন। ভ্যাবলার চোখ দুটো আবার কেমন ছলছলিয়ে ওঠে !

কিন্তু ভূপর্যটকদের কি এমন কোরে একজায়গায় দাঁড়াবার ফুরসত আছে ? এমন কোরে পেছন-ফেলে-আসা কিছুর জন্যে হা-হুতাশ করবার অবসর আছে ? ওরা এসে দাঁড়ায় টিকিট ঘরের সামনে ছোটখাটো লাইনের একেবারে শেষে। ওদের ঠিক সামনেই তেলচিটে নোংরা কাপড়-জামা-পরা একটি হিন্দুস্থানী গোয়ালা কাঁচা মুলো চিবোতে চিবোতে এবং মাঝে মাঝে তারই ঢেঁকুর ছাড়তে ছাড়তে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গেই গান ধরেছে গুনগুন কোরে। পল্টু বেচারা নিজের নাকটাকে আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ভ্যাবলার দিকে চেয়ে বললে,—'কি রকব্ বোটকা-বোটকা গল্ধ বেরোচ্ছে ভাই।'

ভ্যাবলা বললে,—'লাক বল্ধ কোরে বুখ দিয়ে লিশ্বাস লে।'

পল্টু বললে,—'তাই তো লিচ্ছি।'

লাইন ক্রমেই ছোট হয়ে আসতে লাগলো। এক এক কোরে টিকিট নিয়ে চলে যাচ্ছে সবাই। ওদের সামনের সেই হিন্দুস্থানী গোয়ালাটি টিকিট কিনছে এবার। এর পরেই ভ্যাবলাদের চান্স।

'একঠো রিটর্ণ টিকস্ দিজিয়ে তো।'—হিন্দুস্থানীটি কোমরের কাপড়ের ভাঁজ থেকে পয়সা বের করতে করতে বলে।

'কোথাকার টিকিট ?—প্রশ্ন আসে টিকিট ঘরের জানালার ভেতর থেকে।

'একঠো রিটার্ণ জী।'

'আহা, রিটার্ণ তো বুঝলুম ; লেকিন তুম জায়গা কাঁহা ?'

'আরে বাবু আপনি তো একঠো রিটার্ণ টিকস্ দিয়ে দেও। কিধার যাবো, সে লিয়ে কি কাম আছে আপনার ?'

'কাজ আছে বৈকি !'—চটে উঠেছেন টিকিটবাবু,—'কোথায় যাবে না জানলে কোথাকার টিকিট দোব ছাই। এ সব উজবুকদের নিয়ে তো মহা মুশ্কিলে পড়া গেল দেখছি।'

'উজবুক কাঁহে বোলতা ?—এহি টিসন্‌কা একঠো রিটার্ণ টিকস্ দিজিয়ে না আপ। হামি তো ফিন্ এহি টিশনেই লৌট আয়গা।'

'মাথা কিনে গা।'—টিকিটবাবুর মেজাজ এবার সপ্তমে চড়ে ওঠে। চিৎকার কোরে ওঠেন,—'হাটো হাটো, তুম্‌কো আমি নেহি দোবো টিকিট। ভাগো।'– তারপর পন্টুর দিকে চেয়ে বলেন,—'কই খোকা, এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, তোমার কি ?'

'একটা রিটার্ণ···' পন্টু আস্তে আস্তে বলে।

'ফের রিটার্ণ!'—টিকিটবাবুর মেজাজের উত্তাপ ঠাণ্ডা হবার অবসর পায় না।—'কোথাকার ?'

'আজ্ঞে কলকাতার।'

'তবু ভাল। ভাবলুম বুঝি তুমিও বলবে,—সে খোঁজে আপনার দরকার কিসের ? এই স্টেশনের একটা রিটার্ণ টিকিট দিন, আমি তো ফের এই স্টেশনেই ফিরে আসছি।' —বলতে বলতে কলকাতার একটা রিটার্ণ টিকিট গলিয়ে দেন টিকিটবাবু জানলার খুপরি দিয়ে। ভ্যাবলা আর পন্টু লাইন থেকে বেরিয়ে পড়ে।

'রিটার্ণ টিকিট হঠাৎ কিনলি তুই কি করতে শুনি ?'—ভ্যাবলা ধমক দেয় পল্টুকে,—'তুই কি আবার এই স্টেশনেই ফিরে আসবি নাকি কলকাতা থেকে ?' খুব ভাল লেগেছে বুঝি এই স্টেশনটাকে ? ঐ গয়লাটার গামছাটা বড্ড বুঝি ভাল লেগেছে তোর ?'

'না।'

'তবে ?'

'ঠিক আছে।'

'কী ঠিক আছে ?—কিচ্ছু ঠিক নেই। তুজনের জন্যে তুখানা কলকাতার টিকিট কেনবার কথা, তুই কিন্‌লি একখানা রিটার্ণ। ঠিকটা রইল কোথায় ?'—ভ্যাবলা গজরাতে থাকে।

'আরে চল না তুই। গাড়ীতে গিয়ে বসবি চল তো। গণ্ডগোল কিছু হলে তখন বলিস।'—পল্টু মুরুব্বি চালে এগোয়।

গাড়ী চলতে থাকে। জীবনে এই প্রথম রেলগাড়ী চড়লো ওরা। কী আনন্দই যে লাগে ! জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে সত্যি ফাইন লাগছে !

হঠাৎ চটাস্ কোরে একটা শালপাতা হাওয়ায় উড়ে এসে লাগে ভ্যাবলার মুখে। সামনের কামরায় কারুর শালপাতার ঠোঙায় কোরে চাটনি খাওয়ার সাধ হয়েছিল,—হাওয়ার ধাক্কায় সেটা উড়ে এসে ভ্যাবলার মুখে চাটনি মাখিয়ে দিয়ে গেল ! ভ্যাবলাদের কামরার সকলে ভ্যাবলার এহেন তুর্দশায় সমবেদনায় আহা-আহা কোরে উঠলেন। ভ্যাবলা কিন্তু রেলগাড়ীর কলে মুখ ধুতে যাবার সময় পল্টুর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে গেল,—'চাটনিটা ব্রে টকটক মিষ্টি-মিষ্টি কিন্তু'রে পল্টু।'

পল্টু বললে,—'তা বোলে তুই ধোওয়ার নাম কোরে ঐ কলের ঘরের ভেতরে বোসে চাটিস্‌নি যেন নিজের গাল।'

ভ্যাবলা বললে,—'পাগল।'

মাঝের স্টেশনে এক টিকিট-চেকার এসে উঠলেন। এদিক্-ওদিক্ টিকিট দেখে হাত পাতলেন পল্টুর সামনে,—'টিকিট খোকা ?'

'টিকিট ?—এই যে, এই নিন।'—রিটার্ণ টিকিটখানা বাড়িয়ে দেয় পল্টু।

'আর তোমার ?'—ভ্যাবলার দিকে ফেরেন চেকার।

'ঐ তো,—ঐ যেটা আমি দিলুম আপনাকে, ঐ রিটার্ণ টিকিটটাই তো আমাদের দুজনের টিকিট।'—ভ্যাব্লার হয়ে পল্টুই জবাব দেয়।

'তাই নাকি ?'—টিট্‌কিরির স্বরে বলেন চেকার,—'এ চালাকি কতদিন শিখেছ ?'

'আজ্ঞে ?'

'ঠিক আছে।—উঠে এসো দিকিনি বাছাধনেরা। তোমাদের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

গাড়ী স্টেশনে আসে একটা। চেকার ওদের হাত ধোরে নেমে পড়েন প্ল্যাটফর্মে। তারপর সোজা একেবারে স্টেশনমাস্টারের ঘরে।

'এই নিন মুখুজ্যেমশাই।—কোথেকে কার একটা রিটার্ণ টিকিট হাত-সাফাই কোরে এঁরা দুজনে ট্রাভল্ করছিলেন।'—চেকার ওদের হাজির করেন স্টেশনমাস্টারের সামনে।

'ইস্, হাতসাফাই বললেই হল নাকি ?—হাতসাফাই করিনি আমরা'—দস্তুর মতন পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছি।'

'কেনবারই ছেলে তোমরা।—যত্ত বদমাইস্।'—ভেংচে ওঠেন চেকার।

'বদমাইস্ বলবেন না।'

এবার স্টেশনমাস্টার স্বয়ং কথা বলেন,—'ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও।—একখানা রিটার্ণ টিকিট নিয়ে দুজনে ট্রেনে উঠেছিলে কেন ?—উঁ ?'

"তাতে কি হয়েছে ?—রিটার্ণ টিকিট কিনেছি, অথচ আমি তো ফিরে যাচ্ছি না।'—পল্টু বোঝাতে চেষ্টা করে যথাসাধ্য। কিন্তু স্টেশনমাস্টারের তবু বোধগম্য হয় না কিছু।

'আহা, বলছি কি,—এই টিকিটটাতে আমি তো কলকাতায় গিয়ে আবার যেখান থেকে এসেছিলুম, সেখানে ফিরে যেতে পারি'।– পল্টু বিশদভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে আবার।

'তাতো পারোই।' স্টেশনমাস্টার স্বীকার করেন।

'আচ্ছা,—এখন ঐ ফিরে যাওয়ার বদলে আমরা যদি ঐ টিকিটে দুজনে শুধু কলকাতায় যাই,—তাতে দোষটা কি হয় ?'—পল্টুর প্রশ্ন।

'দোষ ?'—কথাটা ভাববার বটে।

'হ্যাঁ।—একজনে গাংনাপুর থেকে কলকাতায় গিয়ে আবার গাংনাপুরে ফিরে যাওয়াও যা,—আর দুজনে গাংনাপুর থেকে কলকাতায় যাওয়াও তো একই কথা।'—পল্টু আরো পরিষ্কার কোরে দেয় ব্যাপারটা।

এইবার হেসে ওঠেন স্টেশনমাস্টার হো-হো কোরে।

'না না হাসবেন না আপনারা অমন কোরে!'—পল্টু বুঝতে পারে না হাসির কি আছে এতে!—'আহা, আশ্রমে বুদ্ধির অঙ্ক কষবার সময় আমরা এমনি কোরেই-তো কষি। তাই রিটার্ণ টিকিটই কাটলুম একটা। আর······'

স্টেশনমাস্টার এবং চেকারের অট্টহাস্যে পল্টুর বাকি বক্তব্য চাপা পড়ে যায়।

"বুদ্ধির অঙ্কে আমাদের এরা হারিয়ে দিয়েছে কিন্তু।"—হাসতে হাসতেই স্বীকার করেন স্টেশনমাস্টার। তারপর এমন সাফ্ মাথার ছেলেদুটির পরিচয় নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,—"নাম কি ?"

"ভ্যাবলা।" "পল্টু।"

"কোন্ ইস্কুলে পড়ো ?"

"ইস্কুল তো নয়"—ভ্যাবলা বলে,—"ইস্কুল নয়, আশ্রম। জগত্তারিণী অনাথ আশ্রম থেকে আমরা দুজনে…এই রে!"

"পালা ভ্যাবলা।"

লাফিয়ে উঠে চোঁ-চোঁ দৌড় মেরে পালিয়ে যায় ওরা স্টেশনমাস্টারের ঘর ছেড়ে।

বিস্মিত স্টেশনমাস্টার আচম্‌কা অকারণে ওদের এমন কোরে পালাতে দেখে ডেকে ওঠেন,—"আরে আরে হঠাৎ পালাও কেন? আরে শোনো শোনো,—এই ছাখো,—আরে ও খোকারা…"

খোকারা ততক্ষণে স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা পানওয়ালার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তার জিনিষপত্র উল্‌টে দিয়ে ছুটেছে গ্রামের ভেতরের দিকে।

স্টেশনের ধারের সারিবন্দী ছোটখাটো দোকানের কোল দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে একেবারে গ্রামের ভেতর। সেই রাস্তার মোড় বেঁকে ওরা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ঠিক উল্টোদিক থেকে একটি বিরাট স্থূলকায় লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সেই সারিবন্দী দোকানের মধ্যবর্তী চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো,—"এ-এ-এদিক দিয়ে দু-দু-দুটো ছেলেকে পা-পা-পালাতে দেখেছেন আপনারা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো এক সেকেণ্ড হোল দুটো ছেলে দৌড়ে চলে গেল এই রাস্তা ধোরে। ঐ ডানদিকে বেঁকে গেছে। কিন্তু কেন বলুন তো? কি ব্যাপার?"—চায়ের দোকানের মালিক প্রশ্ন করেন।—'চোর নাকি?'

সেকথার কোনো উত্তর না দিয়েই মোটা লোকটি আবার তাঁর থপ্‌থপে দেহটা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে যান।

পল্টু ও ভ্যাবলা কিছুদূর দৌড়েই একটা গাছের তলায় জিরোতে বসেছিল। হঠাৎ দেখতে পেলে একটি বিপুলাকার লোক রে-রে কোরে

ছুটে আসছে তাদেরই দিকে। ভ্যাবলা বললে,—"নিশ্চয়ই স্টেশনমাস্টারের লোক। আমাদের ধরতে আসছে। পালা পল্টু।"

দৌড় দৌড় দৌড়।—পল্টু-ভ্যাবলাও দৌড়োয় যতো, মোটা লোকটিও দৌড়োন ততো। দৌড় দৌড় দৌড়

## যাত্রাদলের অধিকারী

গ্রামের জমিদারবাড়িতে কাল যাত্রাগান হবে। দল এসেছে কোলকাতা থেকে। জমিদারদের রান্নাবাড়ির তুটো বড়ো ঘর সাফ্ সুদরো করিয়ে সেখানেই তাদের থাকবার জায়গা কোরে দেওয়া হয়েছে! সন্ধ্যের সময় তারই একটা ঘরে শতরঞ্জি বিছিয়ে মিটমিটে একটা হ্যারিকেনের আলোয় যাত্রাদলের রিহার্শ্যাল বসবার উদ্যোগ হচ্ছে।

"আমাদের বিষ্টুকে দিয়ে ও-পার্টটা চালিয়ে নেওয়া যায় না শ্যামবাবু?" —একজন আম্‌তা আম্‌তা কোরে বলে।

শ্যামবাবুই দলের অধিকারীমশাই। রোগা খেঁকুরে লোকটি। হাতের বিড়িতে কসে একটা টান দিয়ে খিঁচিয়ে ওঠেন,…"বাজে বকিসনি হরিপদ। একে সকাল থেকে মেজাজ ঠিক নেই।"

"কিন্তু যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। কাল প্লে।"

"সেটা বোধহয় তোমাদের চেয়ে আমার বেশী জানা আছে।" আবার খিঁচিয়ে ওঠেন শ্যামবাবু।

শ্যামবাবুর মেজাজের অপরাধ নেই। যে কাণ্ডটা ঘটেছে, এখনও যে ভাবনায় পাগল হয়ে যাননি সেইটাই যথেষ্ট! 'নন্দতুলাল' পালা গাইবার

বায়না নিয়ে এসেছেন দল নিয়ে। নিজের দলের যে দুটি ছেলে কানাই-বলাই সাজতো,···দিন কয়েক থেকে তারা ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়েছে। তাই কলকাতার নেত্য অধিকারীর কাছ থেকে তার দলের কানাই-বলাইকে ধার কোরে এনেছিলেন শ্যামবাবু। কিন্তু কে জানতো যে নেত্য অধিকারীর পেটে পেটে এমন শয়তানী বুদ্ধি ছিল ?···কাল প্লে, আর আজ কিনা নেত্য অধিকারীর দলের কানাই-বলাই বলা নেই কওয়া নেই চুপিসাড়ে ভেগে পড়লো ?

হ্যাঁ, পালিয়ে গেছে কানাই-বলাই। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে,—এমনি কোরে শেষ মুহূর্তে ডোবাবার জন্যেই নেত্য অধিকারী তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে পাঠিয়েছিল !···এখন কাল্‌কের প্লে হবে কি কোরে ?

"ভূতোটাও তো এখনো ফিরলো না। দলের একজন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বোলে ওঠে, "সেই কোন সকালে কানাই-বলাই-এর খোঁজে স্টেশনের দিকে ছুটলো।"

"কে বলেছিল ওকে ছুট্‌তে ?" খিঁচিয়ে ওঠেন শ্যামবাবু—"ছোটবার হলে আমি ছুটতে পারতুম না ? ছুটে ওদের পাত্তা পাবে ?—যাক্‌ —গুপে ?

অন্ধকারের ভেতর থেকে একটি নির্জীব গোছের পাকাটে চেহারার ছোকরা সাড়া দেয়,—"আজ্ঞে ?"

"তুই আর হাবুল উঠে আয় সামনে আলোর কাছে। চট্‌পট্‌-চট্‌পট্‌। তিনকড়ি তুমি প্রম্‌ট্‌ করো।"

"কানাই-বলাই ?"—তিনকড়ি প্রশ্ন করে ভয়ে ভয়ে।

"হ্যাঁ কানাই-বলাই।"

"গুপী আর হাবুল ? ধেড়েকেষ্ট হয়ে যাবে না ?"

"তা' কচি কানাই-বলাই এখন পাচ্ছি কোথায় ছাই ?" দাঁত কিড়মিড় কোরে ওঠেন শ্যামবাবু—"তিনকড়ি, প্রম্‌ট।"

গুপী আর হাঁবুল আসরের মাঝখানে এসে আলোর কাছে দাঁড়ায় ভয়ে ভয়ে। তিনকড়ি প্রম্‌ট করে,—

"দাদা, দাদা,—যশোদা জননী
রাখিয়াছে ননী,
চলো যাই মোরা খাইগে এখনি।"

গুপী ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় কাঁপতে কাঁপতে বলে,—"দাদা দাদা, যশোদা এখনি খাইয়াছে ননী!"

"কর্মের ধুচুনি!"—ভেংচে ওঠেন শ্যামবাবু—"যশোদা ননী খায় নাই, খাইয়াছিল কানাই অর্থাৎ তুমি!—আহা, ননী খাওয়াই চেহারা বটে, হাড়গিলে কোথাকার!"

গুপী কি একটা প্রতিবাদ করতে যায়,—তাকে থামিয়ে দিয়ে সজোরে চিৎকার কোরে ওঠেন শ্যামবাবু, "দূর হয়ে যা হতভাগা!"

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে আওয়াজ আসে,—"পেয়েছি পেয়েছি,—ধরে এনেছি।"

ঘরের সকলে প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে,—"ভূতো!"

## ভূতো দি গ্রেট

হুড়মুড় কোরে দু-বগলে পল্টু ও ভ্যাবলাকে সাপটে ধোরে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হয় ভূতো, অর্থাৎ সেই তোৎলা মোটা লোকটি।

কোত্থেকে পেলি?—এত দেরি হল কেন?—কোথায় পালিয়েছিল?—ইত্যাদি নানা প্রশ্নে ভরে ওঠে স্বল্পালোক ঘরটি। সব কিছু প্রশ্নকে ছাপিয়ে শ্যামবাবু চিৎকার কোরে ওঠেন,—"বড্ড যে পালানো হয়েছিল, য়্যাঁ?"

বলতে বলতে অধিকারীমশাই হ্যারিকেনটি তুলে ধরেন ওদের মুখের

সামনে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে চিৎকার কোরে ওঠেন,—"আরে! এরা কে?—এ কাদের তুই নিয়ে এলি রে ভূতো?"

আরো ঘণ্টাখানেক পরের কথা। রিহার্শ্যাল-ঘরের থেকে খানিকটা দূরে উঠোনের ওপর একটা তক্তপোশে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল ভূতো। তিনকড়ির হাতে একটা চুনের ভাঁড়। আঙ্গুলে কোরে চুন লাগিয়ে দিচ্ছিল তিনকড়ি ভূতোর পিঠের এখানে-ওখানে ফোঁটা-ফোঁটা কোরে।

ভূতো প্রায় আর্তনাদ কোরো উঠলো,—"উহুহুঃ আঁ-আঁ-আঁচড়ে সারা পিই-ইঠটা একেবারে ছিঁ-ছিড়ে দিয়েছে রে বাবা।"

সত্যিই ভূতোর পিঠটা ক্ষত-বিক্ষতই হয়ে গেছে। কীর্তিটা পল্টু এবং ভ্যাবলার। ভূতো যখন ওদের বগলদাবা কোরে নিয়ে আসছিল, তখন আত্মরক্ষার জন্যে ওরা ওদের আঙ্গুলের নখগুলোই ব্যবহার করেছিল নিরুপায় হয়ে।

তিনকড়ি চুন লাগাতে লাগাতে সমবেদনার সুরে বললে,—"শুধু শুধু তোর এই হয়রানী।"

কথাটা ভূতোর ভাল লাগে না,—"য়্যা-য়্যা-য়্যখন তো সবই আমার দোষ হবে। আ-আ-আমাকে যত্নে বললে যে কে-কে-কে-কে-কে-কে · "

"কেষ্ট?"—তিনকড়ি সাহায্য করে।

"হ্যাঁ। যত্নে বললে কেষ্ট আর ব-ব-বলাই ভেগেছে! ল-ল-লম্বা দিয়েছে এস্টেশনের দিকে। সে-সে-সেই শুনে · উহুহুঃ একটু আস্তে আস্তে চুন লাগা, জ্বালা করছে বড়·· সে-এই শুনে ছোঁড়াদের ধো-ওরে আনবার জন্যে দো-ঔড়লুম কিনা, তাই দোষ হ'ল আমার।"—সকলের অবিচারে অত্যন্ত দুঃখ হয় ভূতোর।

"তা তুই এ-দুটোকে নিয়ে এলি কি বোলে? তুই কি এর আগে নেত্য অধিকারীর দলের কানাই-বলাইকে দেখিসনি?"—তিনকড়ি প্রশ্ন করে।

"কী-ই-ই-কোঁরে দেখবো ?—আমি তো কো-ওলকাতা থেকে এসেই শুনলুম নে-এত্য অধিকারীর দল থেকে যে ছে-এলে ছুটোকে ধা-আর কোরে আনা হয়েছে, তারা বে-এড়াতে বেরিয়েছে। তার আধঘণ্টা বাদে শুনলুম তারা ভা-আগবার তা-আলে আছে! তার আধঘণ্টা বাদেই শুনলুম, তারা ভে-এগেছে।—চে-এ-এহারা দে-এখলুম, কখন বল ?" —ভূতো বলতে থাকে।

"তারপর ?"—তিনকড়ি প্রশ্ন করে, "এ-ছুটোকে কিন্তু নিয়ে এলি কি কোরে ?"

"ভে-এগেছে শুনেই তো দো-ঔড়লুম ?"

"হ্যাঁ।"

"স্টে-এশনের কাছে গিয়ে জি-ই-ই-জ্ঞেস করলুম, দু-উটো ছেলেকে পালাতে দেখেছেন ? তারা বললে,—হ্যাঁ।—ঠিক একই দিনে এ-গাঁয়ের বি-ই-ই-ই-ইশ জোড়া ছেলে যে পা-আ-আলাতে শুরু করেছে,—তা' কি আমি হা-আ-আ-ত গুণবো ?"—ভূতো প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে।

ঠিক এই সময় রিহার্শ্যাল-ঘরের ভেতর থেকে যাত্রাদলের একটি ছেলে, হরিপদ তার নাম, তক্তপোশের কাছে **এসে** চেঁচিয়ে ওঠে,—"কেল্লা ফতে।"

"কি ব্যাপার ? এত আনন্দ কিসের ?"—তিনকড়ি প্রশ্ন করে।

"ফাইন্ গানের গলা রে ছেলে দুটোর। শুনলুম সৎমার অত্যোচারে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছিল।"

পল্টু সেই একই গল্প এখানেও বানিয়ে বোলে দিয়েছে!

হরিপদ সুখবরটা দেয় শেষ অবধি,—কালকের যাত্রায় ওরাই কানাই-বলাই-এর পার্টে নামবে। শ্যামবাবু রিহার্শ্যাল শুরু কোরে দিয়েছেন।"

খবরটা শুনে আনন্দে তিনকড়ি তো নেচেই ওঠে। ভূতো শুধু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে,—"পা-আ-আ-য়ের ধুলো নে আমার।"

তা' পায়ের ধুলো নেবারই কথা বটে। ভাগ্যিস ভূতো ভুল কোরে ওদের এনেছিল, তাই তো সব দিক রক্ষে হোল।

"বেড়ে পার্ট বলছে রে ছেলে ছুটো"—হরিপদ প্রশংসায় চোখ ছুটো বড় বড় কোরে তোলে।

আবার একচোট চাল মারে ভূতো,—"কে আ-আ-আনলে তাই বল? —ই-ই-ইম্পোর্ট করলেটা কে?"

"সত্যি, হাতযশ আছে ভূতোর।"—তিনকড়ি স্বীকার করে।

"তো-ও-ওবু এ-এ-একটাও ভাল পার্ট দেয় না আমাকে শ্যা-য়্যা-য়্যা-য়্যামবাবু।"—ভূতো অনুযোগ করে।

"তা' অমন কিস্তীবন্দী চালে কথা বললে কী পার্ট দেবে তোমায় লোকে?"—হরিপদ শ্যামবাবুর হয়ে বলে।

"ক্যা-য়্যা-য়্যানো?—সী-ই-ই-ই-ইতার বনবাসে রা-আ-আ-আবণ?" —ভূতো সঙ্গে সঙ্গে নিজেই জবাব দেয়,—"রা-আ-আ-আ-বণের দ-অ-অশটা মুণ্ডুর মধ্যে এ-এ-একটাও কি তোৎলা ছিল না বলতে চাস্?"

পরদিন। জমে উঠেছে যাত্রার আসর।—মা যশোদা ধড়া-চূড়ো দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছেন তাঁর কানাই-বলাইকে। বেহালা আর ক্ল্যারিওনেট সুর ধরেছে তীব্র স্বরে।

বলাই-বেশী ভ্যাবলার চোখছুটো কেবলই যেন জলে ভরে আসছে। তার কেবলই মনে পড়ছে ব্রজসুন্দরী দেবীর কথা। কেবলই মনে হচ্ছে, যশোদা নয়, মাসীমাই যেন নতুন জামা-ইজের পরিয়ে দিচ্ছেন ওদের ছুটিকে। বড্ড মন-কেমন করে ভ্যাবলার!

কানাই-বলাইকে সাজিয়ে দিয়ে যাত্রার যশোদা তখন গান ধরেছেন,—

"না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।"

* * *

ওদিকে ঠিক সেই সময় হরিপদবাবুর কোয়ার্টারের অন্ধকার উঠোনে এসে গান ধরেছে সেই বৈরাগীটি। দাওয়ার সিঁড়ির ওপর বোসে আছেন ব্রজসুন্দরী একা। আজ আর পাশে নেই সেদিনকার মতন পল্টু আর ভ্যাবলা। বৈরাগী গাইছে,—

"ও গো মা নন্দরাণী, নীলমণি তোর মানব নয়।
( ও তোর ) কানাই-বলাই ব্রজের আলো, তারে কি সাজা দিতে হয় ?
কানু বিনে আঁধার পুরী
জল নেমেছে নয়ন জুড়ি
( ও তার ) ননী-চুরি, মাখন-চুরি, সে-চুরি তো চুরি নয়॥

হুহু কোরে জল নেমে আসে ব্রজসুন্দরীর চোখে।—কানু বিনে আঁধার পুরী!—ওদের ঐ এতটুকু একটা মাছ-চুরি, সে যে চুরি নয়, তা কি ব্রজসুন্দরীর চেয়ে বেশী কোরে জানেন কেউ?—কে জানতো যে ঐটুকু সাজাতেই অতখানি অভিমান কোরে চলে যাবে ওরা?

বৈরাগী তখনও গাইছে,—"ও তার ননী-চুরি মাখন-চুরি সে-চুরি তো চুরি নয়।" জল আর বাধা মানে না ব্রজসুন্দরীর চোখে।

* * *

এদিকে যাত্রার আসরের শ্রোতাদের চোখেও জল এসে গেছে তখন। নাটকের অনেকগুলো দৃশ্য এগিয়ে গেছে। কানাই-বলাই চুরি কোরে

কোন গোপের বাড়ী ননী খেয়ে এসেছে, মা-যশোদা তাই পাঁচন-বাড়ি নিয়ে মারতে এসেছেন তাদের। কানাই-বলাই করুণ কণ্ঠে গাইছে—

"মারিস নে মা নন্দরাণী
চুরি কোরে আর খাবো না।
গোঠে লয়ে যাবো ধেনু
বাজাবো না মোহন বেণু
ও তোর, গোরা-বলাই কালো-কানু
ননী-চোরা আর হবো না ॥"

গান শুনতে শুনতে স্বয়ং অধিকারী শ্যামবাবুর চোখেই জল এসে যায়।—আহা, কী গানই গাইছে ছেলেদুটো!

গাইতে গাইতে ভ্যাবলার কেবলই মনে পড়ে যায়, মাসীমাকে লেখা তাদের চিঠির কথা। আহা, চিঠি না লিখে ঠিক এমনি কোরে কেঁদে মাসীমার সামনে দাঁড়িয়ে যদি ভ্যাবলা বলতে পারতো,—"মাসীমা গো, আর কখ্খনো চুরি করবো না। আর শাস্তি দিয়োনা!" ভ্যাবলার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল।

চিকের আড়ালে বোসে গান শুনতে শুনতে জল গড়িয়ে পড়ে জমিদার-গৃহিণীর চোখে। পার্শ্বোপবিষ্টা দাসীকে ঠেলা দিয়ে বলেন,—"মোক্ষদা,—যাত্রার অধিকারীকে বোলে আয়,—কাল সকালে ঐ কানাই-বলাই আমার কাছে ভাত খাবে!

পরদিন দুপুর। যাত্রার দল ফিরে যাচ্ছে আবার কোলকাতায়। গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে মন্থর গতিতে পর পর চলেছে পাঁচটি গোরুর গাড়ী স্টেশানের দিকে। সবার শেষের গাড়ীটিতে আছেন স্বয়ং অধিকারীমশাই আর পল্টু ও ভ্যাবলা।

জমিদার-গৃহিণী দুখানি কোরা ধুতি আর দুখানি ছিটের সার্ট দিয়েছেন

ওদের। নিজে সামনে বোসে খাইয়েছেন কতো সব খাবার। আর দিয়েছেন দুজনকে দশটা কোরে টাকা। অধিকারীমশাই পল্টুকে বারবার বুঝিয়েছেন,—যাত্রার দলে থাকার সুবিধে কতো। ভাল অভিনয় করতে পারলে এমনি কতো টাকাই রোজগার করা যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ছইয়ের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন অসাড়ে।

নতুন কাপড়টি আর জামাটি পরে ভ্যাবলা গাড়ীর পেছনের দিকে চুপ কোরে বোসেছিল দূরের দিকে চেয়ে। পল্টু তার কানে ফিসফিসিয়ে বললে,—"কোলকাতায় পৌঁছতে দে না একবার ;—তার পরেই প-এআকার।"

ভ্যাবলা তেমনি চুপ কোরে থাকে।

পল্টু এবার গভীর স্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বলে,—"মাসীমার জন্যে মন-কেমন করছে বুঝি রে? মন-খারাপ করিসনি, দূর্! আবার তো বড় হলে আমরা ফিরে যাব মাসীমার কাছে।"

ও-পাশের কোন একটা গাড়ী থেকে তখন হরিপদ শুধু গলায় গান ধরেছে,—"মারিস্ নে মা নন্দরাণী, চুরি কোরে আর খাবো না।"

## সোমনাথ-দা

শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছে রেলগাড়ী থেকে মালপত্র সব দেখেশুনে নামাতেই ব্যস্ত ছিলেন যাত্রাদলের অধিকারী শ্রীশ্যামলাল সরখেল। সেদিকটা চুকিয়ে যখন হাঁক দিলেন,—"কানাই-বলাই"? তখন পল্টু ও ভ্যাবলা ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে স্টেশনের বাইরে একেবারে হ্যারিসন্ রোডের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আই বাস্! কতো গাড়ী রে!"—ভ্যাবলার চোখদুটো বড়ো হয়ে যায়।

"এরই নাম হচ্ছে কোলকাতা।"—পল্টু এমন একটা ভঙ্গীতে কথাটা বলে, যেন কোলকাতা শহরটাকে বহুবার ওর দেখা আছে, আজ ভ্যাবলাকে দেখাতে এনেছে। তেমনি মুরুব্বিআনা চালে পল্টু বলতে থাকে,—"আজকে এই যে তুই কোলকাতা দেখছিস,—আগে কিন্তু কোলকাতা নাম ছিল না এর। কলিকাতা, গোবিন্দপুর আর সুতোপটি এই তিনটি গ্রামকে এক কোরে······"

"সুতোপটি নয়, সুতানুটি"—ভ্যাবলা ভুলটা শুধ্‌রে দেয় পল্টুর!

"হ্যাঁ, সুতানুটি।—জব চাণক্য নামে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী···"

"চাণক্য নয়, চার্ণক।"—আবার পল্টুর ভুলটা শুধরে দিতে যায় ভ্যাবলা ; কিন্তু তার আগেই পল্টু সোল্লাসে বলে ওঠে,—"চানাচুর!"

চানাচুর?—ইতিহাসে পল্টুর এবম্বিধ উদ্ভট্ জ্ঞান দেখে ভ্যাবলার চম্‌কে ওঠবারই কথা ছিল। কিন্তু মোটেই সে চম্‌কে উঠলো না। কারণ, সত্যিই একজন চানাচুরওয়ালা যাচ্ছিল সামনে দিয়ে, এবং পল্টু কথাটা বলেছিল তারই দিকে আঙুল দেখিয়ে।

চার-আনার চানাচুর কিনে খেতে খেতে এগোতে থাকে ওরা। এবং চানাচুরের প্যাকেটগুলো যখন শেষ হয়, তখন ওরা একটা পার্কের সামনে এসে হাজির হয়ে গেছে।

পার্কের ভেতর একদল ছেলে মহা উৎসাহে ড্যাংগুলি খেলছিল, আর তাদের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে একটি ছাতাওয়ালা-বেঞ্চিতে বসে একটি যুবক অভিনিবেশ সহকারে পড়ছিল একটি বই। বইটির নাম—"How to play good cricket",—যুবকটির নাম সোমনাথ রায়।

বইটি পড়তে পড়তে সোমনাথ মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলো ক্রীড়ারত ছলেগুলির দিকে, এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলো। বেচারা ক্রিকেট খেলার প্রকাণ্ড ভক্ত। ব্র্যাডম্যানের মতে জগৎজোড়া নামকরা একটা ক্রিকেটার

বাংলাদেশ থেকে জন্মালো না,—এ তার বড় দুঃখ! সোমনাথ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাতের বইয়েতে মন দেয়, How to play good cricket.

পল্টু ও ভ্যাবলা এতক্ষণে গুটিগুটি পার্কের ভেতর এসে ঢুকেছে।

"শহরের ছেলেরাও ড্যাংগুলি খেলে তাহলে ?"—ভ্যাবলার অবাক লাগে।

"নতুন শিখছে বোধ হয়।"—পল্টু বলে,—"দেখছিস না, খেলতে পারছে না মোটেই।"

"খেলবি নাকি ওদের সঙ্গে ? দেখিয়ে দিবি নাকি, ড্যাংগুলি খেলা কাকে বলে ?"—ভ্যাবলা জিজ্ঞেস করে।

"আপত্তি নেই!"—পল্টু ঘাড় নেড়ে জানায়।—কিন্তু ওদের আপত্তি হবে না তো ?"

আপত্তি কিন্তু মোটেই হোল না ও-পক্ষের। ওরা সানন্দেই দলে টেনে নিলে ভ্যাবলা আর পল্টুকে।

খেলা স্বরু হয়ে গেল।

"এক্‌কা, দোক্‌কা, তিন-তেরেক্‌কা—এই রে!"—নিজের কব্জির জোর দেখে নিজেই হতভম্ব হয়ে যায় পল্টু।

গুলিটি সটান সজোরে গিয়ে লেগেছে সোমনাথের কপালে!

"আমরা কিছু জানি না মশাই। এই—এই—এই যে এই ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া।"—ছেলের দল পল্টুকে ধোরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় সোমনাথের সামনে।

"কে তুমি ?—কি—নাম তোমার ?" পল্টুর হাতটাকে চেপে ধোরে প্রশ্ন করে সোমনাথ। কপালটা ফুলে উঠেছে বেশ।

"চিনিই না ওকে আমরা। একদম চিনি না। একটুও না। দেখিই নি কোনোদিন। ওর নামই বা জানতে গেছে কে ? কোথাকার

উট্‌কো ছেলে একটা। বাউণ্ডুলের মতন হাঁকড়ালে দেখুন না।"—ছেলের দল সবাই মিলে হিজিবিজি কোরে জবাব দেয়।

"তোমাদের ফোপরদালালি করতে বলেছে কে?"—দাবড়ানি দেয় সোমনাথ। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে চম্পট দেয় ছেলের দল। দাঁড়িয়ে থাকে কেবল ভ্যাবলা।

"তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে?"—তেড়ে ওঠে সোমনাথ. পল্টুর হাতটা তখনও ছাড়ে নি।

"আজ্ঞে, ও আমার ছোট ভাই। আমার আপন ছোট ভাই। ওর নাম ভ্যাবলা।"—পল্টু পরিচয় দেয় ভয়ে ভয়ে।

"ওঃ তোমারই ভাই?"—ভ্যাবলার হাতটাও চেপে ধরে সোমনাথ। —"কোথায় থাকো তোমরা?"

মাসীমাদের কোয়ার্টারে পল্টুর শেখানো সেই গল্পটাই শুনিয়ে দেয় ভ্যাবলা। সেই তাদের কল্পিত বাবার দু-বার বিয়ে করার গল্প,—সৎমার অত্যাচারের গল্প,—আর তারই ফলে তাদের দুটি ভাইয়ের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসার বানানো দুঃসংবাদ। বেশ ভিজে ভিজে গলায় করুণ কোরে গল্পটা গুছিয়ে বলে দুজনে।

"যোগাড়-যন্তর কোরে একটা বিয়েই কোরে উঠতে পারলুম না আমি, আর তোমাদের বাবা লোকটা কি না দু-দুটো বিয়ে কোরে বসলেন সটান্? তার ওপর এমন দুটি ছেলে থাকতে?"—আশ্চর্য লাগে সোমনাথের! জিজ্ঞেস করে,—"তা এখন কোথায় যাবে ঠিক করেছ?"

"যে দিকে দু-চক্ষু যায়!"—কথাটার সঙ্গে লাগসই একটা দীর্ঘশ্বাসও জুড়ে দেয় পল্টু।

"তোমাদের চক্ষু দুটো তো যেখানে ফেলবে সেখানেই গিয়ে পড়বে। —ঐ নর্দমা, ঐ চারতলা বাড়িটা, ঐ ট্রামের লাইনটা—সর্বত্রই তো অবাধ গতি তোমাদের চোখের। তাই বোলে ওসব জায়গায় কি আর আশ্রয়

নেওয়া চলে ?’’—সোমনাথ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।—“বাংলার এতবড় একটা ভারী ক্রিকেটারকে তো এমনি ভাবে নষ্ট হতে দিতে পারি না আমি,—কিছুতেই নয়।’’ সোমনাথ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়।—“এই ট্যাক্সি।’’

ট্যাক্সির মধ্যে উঠে পড়ে তিনজন। পল্টু আর ভ্যাবলা অবাক্ হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে ট্যাক্সি চড়ার অভিজ্ঞতা ওদের।

“তোমাদের কিন্তু প্রকাণ্ড বড় ক্রিকেট্ খেলোয়াড় হতে হবে।’’—পল্টুকে ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে সজাগ কোরে তুলতে চায় সোমনাথ,—“রঞ্জি, অমরনাথ, মানকাদ, সুঁঠে ব্যানার্জী, কার্তিক বোস—সবার চেয়ে বড়ো। বলতে নেই, এই বয়সেই তোমার যা কব্জির জোর দেখলুম,—তুমি তা পারবে, নিশ্চয়ই পারবে! পারবে না ?’’ কপালের ফুলো জায়গাটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে সোমনাথ।

“ক্রিকেট ?—মানে সেই ব্যাট্‌বল খেলা তো ? আমার খুব ইচ্ছে করে খেলতে।’’—পল্টু এতক্ষণে সহজ হয়ে কথা বলে।

“হুঁ, ইচ্ছে যে করতেই হবে’’—আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে সোমনাথ,—“ক্রিকেটার হবার জন্যেই যে জন্মেছ তুমি। একথা তোমাদের বাবা বোঝেন নি। বুঝলে কি আর আবার একটা বিয়ে কোরে তোমাদের তাড়ান ? তোমাদের ঐ সৎমা,—কোনোদিন ক্রিকেট খেলতে পারবেন ভেবেছ ?—আরে দূর্। কোনো ক্রিকেটারের বৌ-ই পারলো না, তা ভারী তোমার সৎমা।—তুমি হবে ব্যাট্‌স্‌ম্যান্—সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি হাঁকড়াবে। বাউণ্ডারী......ওভার বাউণ্ডারী!—আর তোমার ঐ ভাই, ঐ ক্যাবলা—’’

“ক্যাবলা নয়, ভ্যাবলা ওর নাম।’’

“হ্যাঁ হ্যাঁ ভ্যাবলা—ঐ ভ্যাবলাকে বোলার তৈরী কোরে নিতে হবে চেষ্টা চরিত্তির কোরে। তখন তোমাদের নাম-ডাক শুনে তোমাদের ঐ বাবা যদি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা

টিপ কোরে স্রেফ একটি ওভার-বাউণ্ডারী।”—ভবিষ্যতের সমস্ত প্ল্যান এখন থেকেই, এই মুহূর্তেই ছকে ফেলতে চায় সোমনাথ।

“তোমরা ছু’জন আমার কাছে আমারই বাড়িতে থাকবে,—বুঝতে পেরেছ? কেউ নেই আমার বাড়িতে, শুধু আমার এক অন্ধ ঠাকুমা ছাড়া। কিছু করতে হবে না তোমাদের,—একটু লেখাপড়া, আর কেবল ক্রিকেট্ প্রাক্‌টিস করবে তোমরা আমার বাগানে।”

গাড়ী ছুটে চলে।

## বিলিতি গণৎকার!

“এই এই বাঁধ্‌কে।”—গাড়ীটা হঠাৎ ঘ্যাঁচ্ কোরে থেমে যায় সোমনাথের নির্দেশে।

“এই আপনার বাড়ি বুঝি?”—পল্টু সাইনবোর্ডওয়ালা একটা দরজার দিকে তাকিয়ে বলে।

“না, এ বাড়ি আমার নয়। যাঁর বাড়ি, তিনি মস্ত বড় নামজাদা লোক। প্রকাণ্ড গণৎকার। কতো বড় বড় লোক সব নিজেদের ভবিষ্যৎ জেনে যান এঁর কাছ থেকে।”

পল্টু ও ভ্যাবলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চায় সোমনাথ।

ভ্যাবলা বল্লে,—“আমাদের আশ্রমেও একজন গণকঠাকুর আসতেন।”

“আশ্রম?”—সোমনাথ ভ্রূ কুঁচকোয়!

“আমাদের বাড়ির পাশেই বোষ্টমদের একটা আখড়া আছে কিনা, সেইটারই কথা বলছে ভ্যাবলা’—পল্টু কোনক্রমে ভ্যাবলার বেফাঁস কথাটা চাপা দিয়ে দেয়।

"একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সোনার আংটি হারিয়েছিল"···ভাবলা বোকার মত বেফাঁস বলতে যায়। সোমনাথ আবার ভ্রূ কুঁচকোয়,—"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ"—পণ্টু আবার মানিয়ে নেবার ফিকির করে,—'আখড়ার হেড্-বাবাজীকে আমরা ঠাট্টা কোরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলতুম্ কিনা তাই বলছে ?'

সোমনাথ বলে,—"ও !"

ভাবলা বলে,—"হ্যাঁ—সেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আংটি হারাতে একজন গণকঠাকুর এসে কুষ্ঠী আর হাত দেখে বলে দিলেন যে···"

বাধা দিয়ে সোমনাথ বলে,—"আরে না, না। ইনি অমন পুরনো ধাঁচের গণৎকার নন। কুষ্ঠী-ফুষ্ঠীর ধার ধারেন না ইনি। আর শুধু হাত নয়;—হাত, পা, গলা, বুক, কপাল, চোখ, কান, নাক, চুল, দাঁত, জিভ—সব কিছু দেখে বলে দিতে পারেন মানুষের ভবিষ্যৎ।—এঁদের ইংরেজিতে বলে ফ্রেনোলজিস্ট্। মানুষের কপালের উঁচুত্ব, নাকের খ্যাঁদাত্ব, দাঁতের ত্যাড়াব্যাঁকাত্ব, চোখের ট্যারাত্ব, কানের চুলত্ব,—মানে এক কথায় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন দেখে বলে দিতে পারেন, কে কি হবে ;—কার কি হবে।"

"আইবাপ্!"—এছাড়া আর কিছুই বেরোয় না পণ্টু ও ভাবলার মুখ থেকে। এবং যথাসময়ে ওরা তিনজনে উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার ঘরের মধ্যে ঢালা ফরাসের ওপর বসে পড়ে !

"ক'জনের ভবিষ্যৎ গণনা করা হবে ?"—একটি রোগাপানা ভদ্রলোক ইয়া মোটা ধক্কড় এক খাতা নিয়ে জিজ্ঞেস করেন। গণকঠাকুরের মাইনে-করা কেরানী ইনি।

"একজনের, শুধু এই ছেলেটির।"

"নাম ?"

"পল্টু ।—বয়েস ধরুন তের ।"

ঢাউস খাতাখানা মুড়ে রেখে রোগাপানা লোকটি পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেন এদের। একটি লোক কোট্-প্যান্ট-টাই-এ ফিট্‌ফাট্ হয়ে বসেছিলেন। তিনিই গণৎকার। সোমনাথ পল্টুকে এগিয়ে দেয় তাঁর দিকে।

ফ্রেনোলজিস্ট গণকঠাকুরের পরীক্ষা শুরু হয়। শুরু হয় পল্টুর চুলের ডগা থেকে,—শেষ হয় পায়ের কড়ে আঙ্গুলের নখে এসে। টিপে, চিমটি কেটে, হাত বুলিয়ে, সুড়সুড়ি দিয়ে, কাতুকুতু লাগিয়ে সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করেন গণকঠাকুর। তারপর রায় দেন,—"এর প্রকৃতিটা হবে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট। ভবিষ্যতে মস্তবড়ো গাইয়ে হবার সম্ভাবনা রয়েছে।"

"গাইয়ে !!!"—রাগে ফেটে পড়ে সোমনাথ। "অসম্ভব !"—হতেই পারে না। ছিঁচকাঁদুনের মতো বিনিয়ে বিনিয়ে গান গাইবার জন্যে ভগবান এই ছেলের এতখানি শক্ত কব্জি দেন নি কিছুতেই। কিস্যু জানেন না আপনি।"

সোমনাথ নিজেকেই এবার এগিয়ে দেয় ফ্রেনোলজিস্টের কাছে,—"বলুন তো আমার সম্বন্ধে কী ধারণা আপনার ? দেখি, বিদ্যের দৌড়।"

সোমনাথ যতো চটে, ফ্রেনোলজিস্ট্ তার চেয়ে চটে যান। বলে কিনা,—কিস্যু জানে না ? কিন্তু রাগ দমন করেন। চট্‌লে ব্যবসা হয় না।

"কৈ বলুন ? বলুন আমার সম্বন্ধে কী মনে হয় আপনার ?" সোমনাথ আবার তাগাদা দেয়।

"আপনি ?"—সোমনাথের আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ কোরে পরীক্ষা করতে করতে ফিটফাট ফ্রেনোলজিস্ট বলেন,—"চিন্তাশীল দার্শনিক হবার চিহ্ন রয়েছে আপনার।"

"দার্শনিক ?"—সোমনাথ খিঁচিয়ে ওঠে। "ইণ্টারমিডিয়েট লজিকেই ফেল্ করলুম, আর বলে কিনা দার্শনিক !—অসম্ভব !"

"কিন্তু দার্শনিকের লক্ষণ রয়েছে আপনার কপালে।"—ফ্রেনোলজিস্ট গম্ভীরভাবে বলেন।—"আপনার কপালের ঐ যে একদিকে উঁচু-উঁচু ফুলো-ফুলো ভাব, ওটা দার্শনিকের লক্ষণ।"

"ওটা কিসের লক্ষণ ?"—সোমনাথ ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে।

"দার্শনিকের।"—উত্তর দেন ফ্রেনোলজিস্ট।

"আপনার দর্শন-শক্তিটা ঠিক আছে তো ?"—সোমনাথ বাঁকা সুরে কথাটা বোলে ফ্রেনোলজিস্টের মোটা কাঁচের চশমার দিকে তাকায়।

"তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।"—এবার ধৈর্য-চ্যুতি হয় ফ্রেনোলজিস্টের।

"ঘামাতে একটু হবে বৈকি !"—সোমনাথ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে একেবারে। পল্টুকে বলে গাইয়ে, সোমনাথকে বলে দার্শনিক ! এসব শোনবার পর মাথা ঠিক থাকে কখনো ? সোমনাথ টিট্‌কিরির সুরে বলে,—"আমার কপালের এক দিকের ঐ ফুলো ফুলোটা যদি দার্শনিকের লক্ষণ হয়, তাহলে—"

তারপরেই সোমনাথ অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে বিটকেল এক কাণ্ড কোরে বসলো। ফ্রেনোলজিস্টের মাথাটা পেছনের দেওয়ালে আচম্‌কা ঠুকে দিল ধাঁই কোরে সজোরে ! সঙ্গে সঙ্গে উফ্. কোরে মাথায় হাত দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন ফ্রেনোলজিস্ট, এবং দেখতে দেখতে মাথার পেছন দিকটা আলুর মত ফুলে উঠলো !

ফ্রেনোলজিস্টের মাথার সেই আলুতে হাত দিয়ে সোমনাথ ভেংচিয়ে বললো,—"আপনি কি হবেন জানেন ? আপনি হবেন একটি পাক্কা গাঁটকাটা। আমাদের পাড়ায় মক্‌বুল নামে একটা পকেটমার আছে,

তার মাথায় ঠিক অমনি একটা আলু আছে। ওটা হ'ল গাঁটকাটার লক্ষণ। বুঝেছেন?"

সোমনাথের মুখ-চোখের চেহারা দেখে ফ্রেনোলজিস্ট বোবা মেরে গেছেন তখন! আর তাঁর খেঁকুরে কেরানীটি লুকিয়েছে টেবিলের তলায়!

রেগে গরগর করতে করতে পল্টু আর ভ্যাবলার হাত ধোরে বেরিয়ে যেতে যেতে সোমনাথ বলে,—"শুনুন, আমার কপালের ঐ ফুলোটা পার্মানেণ্ট নয়, বুঝেছেন? আপনার মাথার পেছনের ঐ আলুর মতোই ওটাও টেম্পোরারি।—এই যে পল্টুকে দেখেছেন, জেনে রাখুন, এ হবে মস্তবড়ো ক্রিকেটার।—আমার কপালের ঐ ফুলোটি ওরই সৃষ্টি; যেমন আপনার মাথার ঐ আলুটি আমার। বুঝলেন? নিকুচি করেছে আপনার ফ্রেনোলজির!"

ঝড়ের মতন কথাগুলো বলেই সোমনাথ ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সটান্ ট্যাক্সিতে গিয়ে ওঠে।

সোমনাথ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই ফ্রেনোলজিস্ট ক্ষীণকণ্ঠে চিঁ-চিঁ কোরে ওঠেন,—"জ-অ-অ-ল!"

রাস্তায় তখন ট্যাক্সি ষ্টার্ট নিয়েছে,—'ভর্-র্-র-র্!'

## অনীতা-দি

সোমনাথের বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে পল্ট ও ভ্যাবলা। প্রকাণ্ড বাড়িতে মানুষ মাত্র দুটি; সোমনাথ আর তার অন্ধ ঠাকুমা। ঠাকুমা তাঁর ঠাকুরঘরের একপাশে কোথায় যে থাকেন, টেরই পাওয়া যায় না। আর আছে চাকর-বামুন-ঝি-ড্রাইভারে মিলিয়ে ডজন দুয়েক। তারাই সরগরম কোরে রেখেছে বাড়ি।

বাড়ির সাজানো ফুলবাগানের দামী দামী সব গাছ ছেঁটে ক্রিকেট প্র্যাক্‌টিশের মাঠ হয়েছে। সেইখানে উইকেট্‌ পুঁতে ব্যাটিং করে পল্টু, আর বল করে ভ্যাবলা। সোমনাথের চারটে চাকর সব কাজ ছেড়ে শুধু ফিল্‌ডিং খাটে। বাগানের ধারের বৈঠকখানার জানালার একখানি কাঁচও আস্ত নেই,—সব কটা ভেঙেছে! বাউণ্ডারীর আনন্দে সোমনাথ কাঁচ ভাঙ্গার দুঃখ ভুলেছে?—এক একখানা বাউণ্ডারী এক একখানা দামী হীরের সমান মূল্যবান। তার কাছে সামান্য কাঁচ? ফুঃ!

সেদিনও পল্টু ও ভ্যাবলার ক্রিকেট প্র্যাক্‌টিশ চলছিল পুরোদমে। মাথায় একটা কাউন্টিক্যাপ চাপিয়ে সোমনাথ একটা বেতের চেয়ারে বসে তারিফ করছিল ওদের খেলার,—এমন সময় অনীতা এসে হাজির।

"কি হচ্ছে?"

"এসো অনীতা, বোসো।"

"বসবো না, ওপরে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে হবে আগে। মা একটা কি চিঠি দিয়েছেন।"

"চলো।"

অনীতা আর সোমনাথ ওপরের দিকে যায়।

অন্ধ ঠাকুমা আন্দাজে ফল ছাড়াচ্ছিলেন ঠাকুরের জন্যে, চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে সোমনাথ বলে,—"ঠাকুমা, অনীতা এসেছে।"

'কে, নাতবৌ? বোস্‌, দুটো নারকেল নাড়ু আছে দি।'—ঠাকুমা উঠতে যান। চোখে দেখতে না পেলেও ঠাকুর ঘরের সব কিছু তাঁর মুখস্থ।

অনীতা বলে,—"আজ তাড়া আছে ঠাকুমা। মা একটা চিঠি দিয়েছেন।'

'কি চিঠি পড়্‌।

অনীতা সোমনাথের হাতে চিঠিটা দেয়। সোমনাথ চিঠি পড়ে

বলে,—"সোমবার অনীতার জন্মদিন, তাই মাসিমা আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন ঠাকুমা।"

"তা' যাবি। এর আর নেমন্তন্ন কি? কিন্তু হ্যাঁলা নাতবৌ,—তুই এ ঘরে আসবি কবে?"

অনীতা সোমনাথের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে,—"ঠাকুমাটা যেন কী!"

হৃদয় বাঁড়ুজ্যের মেয়ে অনীতাব সঙ্গে সোমনাথের বিয়ের ঠিক হয়ে আছে সেই তখন থেকে, যখন ওদের বয়েস বারো আর সাত। এতদিনে হয়েও যেত বিয়ে, শুধু ঐ অনীতার মার স্বাস্থ্যের জন্যেই পেছিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

গত আট বছর থেকে শয্যাগত হয়ে রয়েছেন অনীতার মা। হ্যাঁ, ঠিক আট বছর। আট বছর আগে অনীতার জন্মদিনে এক উৎসবে বাড়ি যখন নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতে পূর্ণ, সেই সময় অনীতার একটি ছোট্ট ভাই এর কোল ওর কোল হতে হতে কোথায় হারিয়ে যায়। আর তার খোঁজ পাওয়া যায় নি। সেই থেকে মা শয্যাগতা।

অনীতা বলে,—"ঠাকুমা উঠি আজ।"

ঠাকুমা বলেন,—"আচ্ছা, আজ তোব কাজ আছে তাই ছেড়ে দিলুম। জন্মদিনেব খানাপিনা চুকে গেলে একদিন এসে কিন্তু আমাকে কেত্তন শোনাতে হবে নাতবৌ।"

অনীতা বলে,—"কথা দিচ্ছি।"

ঠাকুমা বলেন,—"আচ্ছা, আজ তবে আয়।"

সকালবেলা। নিচের ঘরে বোসে সোমনাথ পল্টু ও ভ্যাবলাকে ক্রিকেট খেলার ইতিহাস শোনাচ্ছিল, আর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব ক্রিকেটারদের ছবি দেখাচ্ছিল একাগ্রচিত্তে। এমন সময়—ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

ভ্যাবলা দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলো,—'হ্যালো'? তারপরেই

বললে,—“আচ্ছা”। তারপরেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সোমনাথকে বললে,—“অনীতাদি।”

সোমনাথ ফোন তুলে নিলে,—“কি খবর?”

“বলতে লজ্জা করছে না?”—ওদিক থেকে অনুযোগের সুর আসে,—“আজ যে আমার জন্মদিন, সেটাও বুঝি ভুলে গেছ ঐ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছুটিকে পেয়ে?”

“মোটেই ভুলি নি। সন্ধ্যের আগেই যাব।”—সোমনাথ বলে,—“তুমি কি মনে করিয়ে দেবার জন্যে ফোন করলে নাকি?”

“হ্যাঁ।—শোনো,—ঐ পল্টু আর ভ্যাবলাকেও মনে কোরে নিয়ে আসবে। ম্যাজিক্ কমিক এই সব নানারকমের ব্যবস্থা করেছেন বাবা ওদের দেখতে খুব ভাল লাগবে। আনতে ভুলো না যেন।”

রায় বাহাদুর হৃদয় বাড়ুজ্যের বাড়িতে আজ খুব ধুমধাম। নিচের হল্‌ঘরে ছোটখাটো একটা স্টেজ্ বাঁধা হয়েছে। সেইখানে নাচ-গান কমিক-ম্যাজিক্ ইত্যাদি সব হবে সন্ধ্যেয়। আত্মীয়-স্বজনে ভরে গেছে বাড়ি। একমাত্র মেয়ের জন্মদিনে প্রতি বছরই এমনি ঘটা করেন হৃদয় বাঁড়ুজ্যে।

অনীতার কিন্তু কেমন ভাল লাগে না এই এত হৈহৈ, এত ঘটা। তার কেবলই মনে হয় তার অসুস্থা মার কথা। এই আজকের দিনে মার মনে সেই হারিয়ে-যাওয়া ভাইটির কথাই তো বেশি কোরে বাজছে! আট বছর আগে অনীতার জন্মদিনের এমনি এক উৎসবের হট্টগোলের মধ্যেই তো সেই ছোট্ট ভাইটি হারিয়ে গেছ্‌লো। অনীতার কেবলই মনে হয়, তার এই অপয়া জন্মদিনটাই সব কিছুর জন্যে দায়ী। আজ যেন তাই তার মার ঘরে যেতেও লজ্জা করছে।

কিন্তু যেতেই হয় মার ঘরে।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। নতুন শাড়ী, নতুন জামা, নতুন গয়না পরে অনীতা ধীরে ধীরে ঢোকে মার ঘরে। মা শুয়ে আছেন রোগশয্যায়, বালিসে হেলান দিয়ে। তাকিয়ে আছেন তিনি দেয়ালে-ঝোলানো একটি ছোট্ট ছেলের ফোটোর দিকে। সেই পাঁচ বছরের হারিয়ে-যাওয়া খোকন! মার চোখে জল।

ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে দরজার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল অনীতা কিছুক্ষণ। তার চোখেও জল চিকচিক করছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনীতা আস্তে আস্তে মার কাছে গিয়ে ডাক্‌লে,—"মা।"

## মা

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে মা যথাসাধ্য সহজ হয়ে বললেন,—"কে? অনু?—আয় আয়,—আয় মা।"

অনীতা খাটের কাছে এগিয়ে এসে প্রণাম করলো মাকে। মা আশীর্বাদ করলেন মাথায় হাত রেখে, চুমো খেলেন চিবুক ছুঁয়ে। খাটের একপাশে রূপোর ট্রেতে রাখা ছিল যুঁইফুলের মালা আর সাদা চন্দন। মা নিজে হাতে অনীতার গলায় পরিয়ে দিলেন মালা,—কপালে এঁকে দিলেন চন্দনের টিপ্। তারপর সহসা অনীতাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো ঝর ঝর কোরে।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটবার পর অনীতা আর একখানি মালা নিয়ে পরিয়ে দিলে তার হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট ভাইটির ছবির ফ্রেমে। কপালের কাছে কাঁচের ওপর দিলে চন্দনের ফোঁটা। নিস্তব্ধ ঘর। ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দটা অনেক জোর মনে হচ্ছে।

মা বললেন,—"আর না, অনু এবার তুমি যাও। বাইরে সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

অনীতা কোনো কথা না বোলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মা বললেন,—"সোমনাথ এলে তাকে আমার ঘরে আসতে বোলো।" অনীতা ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই সোমনাথ এসে ঢুকলো। সঙ্গে পল্টু আর ভ্যাবলা। ওদের পরণে হাফ্‌প্যাণ্ট আর হাফ্‌সার্ট। ভারী সুন্দর মানিয়েছে ওদের দুজনকে। ঠিক যেন ভাল খেলোয়াড়ের মতন।

অনীতার মা চুপচাপ শুয়ে ছিলেন চোখ বুঁজে। সোমনাথ এসে ডাকলে,—"ডাকছিলেন মাসিমা ?"

সোমনাথকে ভারী ভাল লাগে অনীতার মার। ভারী ফুর্তিবাজ ছেলে। ও ঘরে এলেই যেন ঘরের ভারী আবহাওয়াটা কেমন হাল্কা হয়ে যায়, মনের গুমোট কেটে যায়।

সোমনাথের ডাকে চোখ মেলে তাকালেন অনীতার মা। নজর পড়লো পল্টু আর ভ্যাবলার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন,—"এ ছেলে দুটি কে সোমনাথ ?"

"ক্রিকেটার।"

"সে আবার কি ?"

"এরা দুজন মস্তবড় খেলোয়াড় হবে মাসীমা। সেই যে ব্যাট-বল্ খেলা ?—সেই খেলার চৌকষ খেলোয়াড় হবে এরা। কি হাতের জোর জানেন এই ছেলেটির" ?—সোমনাথ পল্টুর দিকে দেখায়,—"ড্যাং-গুলির গুলি দিয়ে আমার কপালটায়"—বলতে বলতে সোমনাথ নিজের কপালে হাত বুলিয়ে আফসোসের সুরে বোলে ওঠে,—"এই রে, চিহ্নটা যে মিলিয়ে গেছে। দু'দিন আগে হলে দেখিয়ে দিতুম মাসীমা। মানে থেঁতলে গেছলো একেবারে।"

"নাম কি তোমাদের ?"—অনীতার মা এবার ওদেরই প্রশ্ন করেন।

"আমার নাম পল্টু।"

"আর তোমার ?"

"আমার নাম ভ্যাবলা।"

পল্টু রেডি হয়ে ছিল,—কোথায় থাকো কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলেই সেই সৎমার গল্পটা কেঁদে কেঁদে বোলে দেবে ; কিন্তু অনীতার মা ওদের কিছু জিজ্ঞেসই করলেন না। সোমনাথের দিকে ফিরে বললেন,—"চিনতে পারলুম না তো ওদের।"

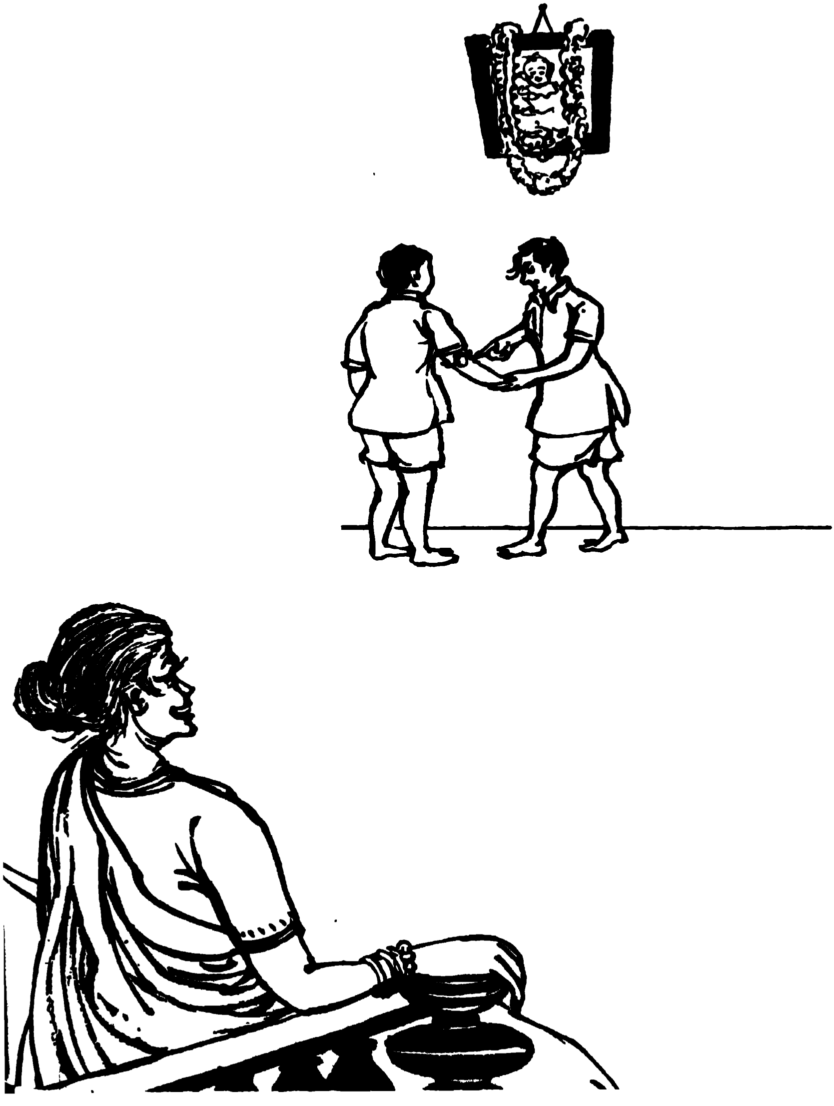
"পরিচয় ?"—সোমনাথ তার স্বভাবসিদ্ধ তড়বড়ে ভঙ্গীতে বলে,—"আমার ভাই। ছোট ভাই আমার এরা।—কি রকম ভাই ?—সে সব অনীতার মুখে এক সময় নেবেন'খন শুনে।"—ব্যস্তভাবে হাতঘড়ির দিকে তাকায় সোমনাথ, তারপর বোলে ওঠে,—"এই রে ! আমি এখন চলি মাসিমা। হল্ ঘরের স্টেজের ড্রপ্ উঠতে পারছে না আমার জন্যে। উদ্বোধনী বক্তৃতাটা আমিই করবো কিনা। আপনি ততক্ষণ আলাপ করুন এদের সঙ্গে,—আমি একটু পরেই আসছি।"

হন্তদন্ত হয়ে সোমনাথ বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল্ কোরে এদিক-ওদিক চায় পল্টু আর ভ্যাবলা। অনীতার মা সস্নেহে বলেন,—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা ? বোসো,—বোসো ঐ সোফায়।"

ভয়ে ভয়ে বসলো পল্টু আর ভ্যাবলা একই সোফায় ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে ! এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে পল্টু আর ভ্যাবলার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে দেয়ালে টাঙ্গানো সেই হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট খোকনের মালা-লাগানো ছবির দিকে।

অনীতার মা বলেন,—"দেখবে ?—দেখবে ভাল কোরে ছবিটা ? যাও না, যাও,—ছবির কাছে গিয়ে ছাখো ভাল কোরে।"

খোকা, একবার কাছে এসো তো,—



কাছে গিয়ে দেখবার এমন কিছু দরকার বা ইচ্ছে ছিল না ওদের। তবু উঠে গিয়ে দাঁড়ালো ছবিটার কাছে। নৈলে উনি কি মনে করবেন !

পল্টু আর ভ্যাবলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভ্যাখে খোকনের ছবির দিকে। পাঁছ বছরের একটি ছোট্ট ছেলে বোসে আছে। হাতে তার একটা দম-দেওয়া খেলনার মোটরগাড়ী। পল্টুর চোখ সেই মোটরগাড়ীর দিকে।

ভ্যাবলা ছবিটার দিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বোলে ওঠে,—"এই ভ্যাখ্ ভ্যাখ্ পল্টু,—ঠিক তোর মতন !"

"কি ? কি আমার মতন ? ঐ খোকার গালের বাঁ-দিকের তিলটা ? ও-আমি অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। ঠিক ঐ রকম তিল তো আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরও ছিল।" পল্টু সেই দম-দেওয়া মোটরগাড়ীর দিকে চোখ রেখেই জবাব দেয়।

"না, না"—ভ্যাবলা বলে,—"ঐ খোকনের হাতের কবচটা এক্কেবারে ঠিক তোর হাতের কবচের মতন রে,—আই বাপ্ !"

কথাটা আব্ছা-আব্ছা যেন কানে যায় অনীতার মার। জিজ্ঞেস করেন,—"কি বলছো বাবা ?"

"এই পল্টুর হাতের কবচটা না,"—ভ্যাবলা ভয়ে ভয়ে ঢোঁক্ গিলে বলে—"ঠিক যেন ঐ ছবির খোকনের হাতের কবচটার মতন দেখতে কিনা, তাই বলছি।"

মাথাটা কেমন যেন কোরে ওঠে অনীতার মার। নিঃশ্বাসটা তাড়াতাড়ি পড়তে থাকে। কাঁপা-কাঁপা গলায় পল্টুকে ডাকেন,—"খোকা, একবার কাছে এসো তো,—কাছে এসো তো আমার।"

পল্টু ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। অনীতার মা কম্পিত হাতে পল্টুর হাতটা নিজের কোলের কাছে টেনে এনে কবচটার দিকে তাকিয়েই চিৎকার কোরে ওঠেন,—"কে ? কে ? কে ? ওরে কে তুই ?"

* * *

বাইরের হলঘরের স্টেজে তখন জমে উঠেছে নাচ। দ্রুত গায়ে নাচ চলেছে। সকলে তন্ময় হয়ে নাচ দেখছেন। অনীতা এবং সোমনাথও একধারে দাঁড়িয়ে নাচ দেখছিল, এমন সময় চুপিসাড়ে একটি বেয়ারা ওপর থেকে নিচে নেমে এসে অনীতাকে জানালে যে, অনীতাকে এখুনি একবার ওপরে মার ঘরে যেতে ডেকেছেন বাবু।

"বাবা ডাকছেন আমাকে? মার ঘরে? এখনি?"—অনীতার বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে ওঠে। মার শরীর হঠাৎ খারাপ হল না তো বেশি? অনীতা সোমনাথকে বলে,—"আমার বড় ভয় করছে। তুমিও চলো আমার সঙ্গে।"

অনীতা ও সোমনাথ নিঃশব্দে হলঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। অতিথি অভ্যাগতেরা তখনো নিবিষ্টচিত্তে নাচ দেখছেন। নাচের তাল তখন আরো দ্রুত হয়ে উঠেছে।

*                    *                    *

নাচ তখনও থামে নি। সোমনাথ আচমকা নাচের মধ্যেই ষ্টেজের ওপর এসে দাঁড়ালো দৌড়ে। উত্তেজনায় তার শরীর তখনো কাঁপছে! তার এই আচমকা আবির্ভাবে চমকে উঠলো সবাই। সোমনাথ বলে উঠলো,—"গুছিয়ে কথা বলবার মত মনের অবস্থা এখন আমার নেই। প্রকাণ্ড একটা অভাবনীয় আনন্দ-সংবাদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে ওপরে মাসিমার ঘরে। আপনাদের সকলকে এখনি তাঁর ঘরে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন।"

কথা শেষ কোরেই সোমনাথ স্টেজ থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়। তার পেছনে পেছনে সবাই কলরব কোরে ওপরে উঠতে থাকেন ভিড় কোরে।

*                    *                    *


পল্টু, তুই তোর

সকলেই উঠছেন সিঁড়ি দিয়ে ; কেবল নামছে একজন। তার নাম ভ্যাবলা। তার দিকে দৃষ্টি নেই কারুর। ধীরে ধীরে ভ্যাবলা একা নেমে আসে সিঁড়ি দিয়ে, তারপর সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে কলকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায়। রাস্তায় নেমে ভ্যাবলা একবার তার জলভরা চোখ তুলে তাকায় বাড়িটার দিকে, তারপর রাস্তা থেকে একটা ইঁটের টুক্রো তুলে নিয়ে বড় বড় অক্ষরে অনীতাদের বাড়ির দেয়ালে লিখে যায়,—"পল্টু, তুই তোর মাকে পেলি। আমার তো কেউ নেই। আমি তাই একাই চললুম। বিদায়।"

কোথায় গেল ভ্যাবলা ?

**ভ্যাবলা কোথায় গেল ?**

রাতের অন্ধকারে ছুটে চলেছে ট্রেন হুইস্‌ল্ দিতে দিতে। মনে হচ্ছে যেন মাকে হারিয়ে ভ্যাবলারই মতন ছোট্ট একটা ছেলে অন্ধকারে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়চ্ছে পাগলের মতন। সেই ট্রেনেরই লম্বা একটা কামরার এক কোণে জানলায় চিবুকটি দিয়ে বোসে আছে ভ্যাবলা পিছু-হটা গাছপালার দিকে চেয়ে। চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে চিবুকের কাছে জড়ো হয়ে পড়ছে টপটপ কোরে।

কোথায় যাচ্ছে ভ্যাবলা ? আবার কি ফিরে যাচ্ছে সেই জগত্তারিণী অনাথ আশ্রমের অন্ধকার খুপ্‌রিতে ? পৃথিবীতে আর কোথায়ই বা আছে তার জানা-মানুষ, চেনা-ঘর ? আর কোথায়ই বা আছে তার মাথা গোঁজবার ঠাঁই ?

চলতে চলতে ট্রেনটা থম্‌কে দাঁড়ায় একটা স্টেশনে ! ভ্যাবলা ধীরে ধীরে নেমে পড়ে গাড়ী থেকে। রাতের অন্ধকারেই গ্রামের মেটে

পথ ধোরে হাঁটতে থাকে একা একা। ভয়? ভয় করলে তো ভ্যাবলার চলবে না। এ-পৃথিবীতে একাই তো তাকে থাকতে হবে, একাই তো তাকে চলতে হবে অন্ধকারে,—হাত ধোরে বিপদ আগলে নিয়ে যাবার মানুষ তো সংসারে কেউ নেই ভ্যাবলার।

কিন্তু চলতে চলতে এ কোথায় এসে পড়লো ভ্যাবলা? জগত্তারিণী অনাথ-আশ্রমের লোহার গেট তো এ নয়। এ কার দরজায় কড়া নাড়ছে সে? অচেনা? না, অচেনা তো নয়। ঐ তো দরজার কড়ার পাশে "রাম" লেখা দেখা যাচ্ছে। সেই যে অনেকদিন আগে পণ্টু একদিন লিখেছিল খড়ি দিয়ে,—যাতে না ভূতেরা কোনদিন ঢুকতে পারে এ-বাড়িতে,—সে লেখা ঐ তো স্পষ্ট ঠাহর হচ্ছে রাত্রের অন্ধকারেও।

ভ্যাবলা কি তবে এইখানে, এই চেনা-বাড়িতে আসবার জন্যেই বেরিয়েছিল অনীতাদের বাড়ি থেকে? নাকি এই বাড়িটাই ওকে হাতছানি দিয়ে মাঝপথ থেকে টেনে এনে ফেললো এই রাতের বেলায়? কি জানি!

ভ্যাবলা সজোরে কড়া নাড়ে,—কড়্ কড়্ কড়্ কড়্।

রাত তখন সাড়ে নটা হবে। ষ্টেশনমাস্টার ১৩ ডাউনটাকে পাশ করিয়ে এসে খেতে বসেছেন সবেমাত্র। বাইরে থেকে কড়া নাড়ার শব্দ ভেসে এলো, আর সেই সঙ্গে ভ্যাবলার চিৎকার,—'মাসিমা, মাসিমা গো, মাসিমা। আমি এসেছি, আমি ভ্যাবলা।'

আনন্দে ও উত্তেজনায় কাঁপছে তখন ভ্যাবলার সমস্ত শরীর,—এমন সময় দরজাটা খুলে যায়।

"কে?"—লণ্ঠন বাড়িয়ে হাঁকেন স্টেশনমাস্টার।

'আমি!'—সোৎসাহে এইটুকু বলেই নিষ্প্রভ হয়ে যায় ভ্যাবলার কণ্ঠস্বর,—"আপনি কে?"

"আমি স্টেশনমাস্টার।"

"স্টেশনমাস্টার!" লণ্ঠনের আলোটা যেন হঠাৎ নিভে যায়

ভ্যাবলার চোখের সামনে থেকে!—সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিরাশ্রয় ভ্যাবলা সব শোনে। শোনে,—বদলি হয়ে গেছেন হরিপদবাবু স্টেশনমাস্টার আজ দিন কুড়ি হ'ল। বদলি হয়ে গেছেন সে কোন্ পলাশডাঙ্গা ষ্টেশনে। তাঁর স্ত্রী ব্রজসুন্দরী দেবীর খুব অসুখ!

আর তো কিছু শোনবার দরকার নেই ভ্যাবলার। ভ্যাবলার ছোট্ট পাদুটি আবার চলতে থাকে অন্ধকার মেটে পথ ধোরে। পিছন থেকে নতুন স্টেশনমাস্টার ডাকেন,—"ও খোকা, এত রাতে একা যাবে কোথায়? শোনো।"—কিন্তু আর যে কিছুই শোনবার নেই ভ্যাবলার;—তাই কিছুই ভ্যাবলার কানে যায় না। ভ্যাবলা হাউহাউ কোরে কেঁদে ওঠে। শিরিষ গাছের ডালে বোসে একটা প্যাঁচা গোল চোখে অবাক্ হয়ে ভাবে, এত্তটুকু ছেলেটা এই নিঝুম্ আঁধারে একা দাঁড়িয়ে কাঁদে কিসের দুঃখে? ভ্যাবলা আবার চলতে থাকে। কোথায়, জানে না ভ্যাবলা। ভ্যাবলা পৃথিবী দেখতে বেরিয়েছে যে!

## পলাশডাঙ্গা

পলাশডাঙ্গা স্টেশন। সকাল ন'টার ট্রেন এসে থামে কলকাতা থেকে। তারই ফার্স্টক্লাসের কামরা থেকে নামতে দেখা যায় পণ্টুকে আর তারই সঙ্গে অনীতা এবং সোমনাথকেও।

ওদিকে পলাশডাঙ্গার নতুন স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টারের দরজা দিয়ে একটি ডাক্তার ঢুকছিলেন হাতে ব্যাগ নিয়ে, ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন হরিপদবাবু। চোখে জল। ডাক্তারের হাতদুটো ধোরে বলেন,—'আর ওষুধ লাগবে না ডাক্তার,—আর ওষুধ লাগবে না।'

ইতিমধ্যে ডাক্তারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে পল্টু, অনীতা ও সোমনাথ। পল্টু বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে হরিপদবাবুর দিকে। হরিপদবাবুরও চোখ পড়ে পল্টুর দিকে। গভীর স্নেহে পল্টুকে জড়িয়ে ধোরে হুহু কোরে কেঁদে ফেলেন ভদ্রলোক,—"এসেছিস্‌,—আয়, আয়, দেখবি আয়।"

পাগলের মতো পল্টুকে টানতে টানতে নিয়ে যান হরিপদবাবু ঘরের জানলার কাছে। বলেন,—"ঐ দ্যাখ্‌!"

পল্টু দ্যাখে। দ্যাখে, একটি টেবিলের উপর অনেক ওষুধপত্তরের শিশি। দ্যাখে, তক্তপোশের ওপর মুদ্রিত চোখে শুয়ে আছেন ব্রজসুন্দরী দেবী,—স্থির নিশ্চল! গায়ের ওপর একটা কম্বল ঢাকা। এই ক'মাসে কী পরিবর্তন হয়েছে তাঁর চেহারার! ঝাপ্‌সা হয়ে আসে পল্টুর চোখ।

কিন্তু আরে আরে! ওকে? ও কার মুখ বেরিয়ে আছে কম্বলের ভেতর থেকে? ভ্যাবলা না? হ্যাঁ ভ্যাবলাই তো! ব্রজসুন্দরী দেবীর ঠিক পাশটিতে শুয়ে ভ্যাবলাও কি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? কিন্তু তবে কেন হরিপদবাবু ডাক্তারবাবুকে বললেন,—আর ওষুধ লাগবে না ডাক্তার?

পল্টু জানলার কাছ থেকে সরে এসে তাকায় হরিপদবাবুর দিকে। বারান্দায় তখন ডাক্তারবাবু, সোমনাথ এবং অনীতাকে নিয়ে বসে পড়েছেন হরিপদবাবু বেতের চেয়ারে। পল্টু শুনতে পায় হরিপদবাবু তখন বলে চলেছেন,—"ওরা সেই যে চলে গেল বাড়ি থেকে, তারপর থেকেই কেঁদে কেঁদে অসুখ বাধালেন আমার স্ত্রী। আজ ভোরে কোথা থেকে ভ্যাবলা এসে হাজির হঠাৎ। আজ তিনদিন এক মুহূর্তের জন্যেও দু-চোখের পাতা এক করে নি যে-রুগী, সে-আজ ভ্যাবলাকে পাশে নিয়ে কেমন শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। তাই তো বলছি ডাক্তারবাবু,—আর ওষুধের দরকার হবে না ওর,—অসুখ ওর ভাল হয়ে গেছে! আমি তো চিনি ওকে।"

পল্টু আবার তাকায় জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর দিকে। ততক্ষণে ঘুম ভেঙ্গে গেছে ব্রজসুন্দরীর। ভ্যাবলাকে জড়িয়ে ধোরে বলছেন,—"আর চলে যাবি না তো ভ্যাবলা আমাকে ছেড়ে?"

কোনো কথা না বোলে ভ্যাবলা তার ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে মাসীমাকে জড়িয়ে ধোরে তাঁর বুকে মুখ লুকোলো।

অসীম আনন্দে ঝরঝর কোরে জল এসে যায় পল্টুর চোখে। মা-বাবা-দিদিকে ফিরে ফিরে পেয়েও সে কাল সন্ধ্যে থেকে একটুও হাসতে পারে নি। শুধু ছুটে বেরিয়েছে ভ্যাবলার খোঁজে। দৌড়ে অনীতার কাছে এসে এতক্ষণে পল্টু হাসিমুখে বলে,—"চলো দিদি, মার কাছে যাই।"